শ্রীশ্রীমায়ের কথা

ষষ্ঠ সংস্করণ

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

তিন টাকা

প্রকাশক—

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা

১৩৫৯

মুদ্রাকর—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৭বি গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিয়া যে-সব কথাবার্ত্তা শুনিতেন তাহা অনেকেই নিজ নিজ 'ডাইরী'তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েক জনের বিবরণী 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-শীর্ষক নিবন্ধে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কল্যাণকর বিবেচনায় উহাই পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইল।

স্বামী অরূপানন্দের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহেই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন।

'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। উহা এই পুস্তকের সহিত সন্নিবিষ্ট করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নিবেদনমিতি—

উদ্বোধন কার্য্যালয়

২১শে আশ্বিন, ১৩৩৩ — প্রকাশক

পরিচয়

১৭৭৫ শকাব্দ, ১২৬০ সাল ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি, রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল, ইংরেজী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে জননী সারদেশ্বরী জন্মগ্রহণ করেন।

জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, মা তাঁহারই তনয়ারূপে ধরিত্রীকে কৃতার্থ করিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

১২৬৬ সালে শ্রীশ্রীমার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। ইহার প্রায় সাত বৎসর পরে তিনি শ্বশুরালয় কামারপুকুরে প্রথম আসেন।

এই যে বিবাহ, ইহা একটি আশ্চর্য্য পরিণয়। শোনা যায়, বিবাহের পূর্ব্বেই রমণীগণের বন-ভোজনস্থলে ঠাকুর ও মা যখন নিজ নিজ জননীর সঙ্গে বন-ভোজনে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহার পর যখন ঠাকুরের নানাস্থানে বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছিল তখন কন্যা যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আছেন এ কথা ঠাকুর স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন এবং জয়রামবাটী গ্রামের সেই ছয় বৎসরের কুমারীটিই তাঁহার মনোনীতা ও নিরূপিতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিবাহের পর সেই মনোনীতা পত্নীর জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। প্রায় সাত বৎসর পরে ১২৭৩ সালে মা কামারপুকুরে প্রথম আসেন। নিতান্ত অল্পবয়স বলিয়া এতদিন

তাঁহাকে আনা হয় নাই। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১২৭৮ সালে ফাল্গুন মাসে মা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন। দক্ষিণেশ্বরে মা নহবতে থাকিতেন। অতি প্রত্যূষে কেহ উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্নান প্রভৃতি হইয়া যাইত। মন্দিরে কর্ম্মচারী অনেক, অতিথি ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগমও যথেষ্ট, কিন্তু কেহই তাঁহার ছায়াটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না। ঠাকুর সর্ব্বদাই ভাবে মগ্ন রহিতেন আর সেই ভাবাবেশেই তাঁহাকে যা কিছু সম্ভাষণ করিতেন তাহাতেই মায়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। যতটুকু স্বামীর সেবাকার্য্যের ভার পাইতেন তাহাই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিত এবং সেই তৃপ্তিতেই তিনি পরমানন্দিতা রহিতেন।

ইহার পর ১২৮০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজার দিন রাত্রে ঠাকুর মাকে ষোড়শীপূজা করেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব দাম্পত্য সম্বন্ধের এইটিই সম্পূর্ণ পরিচয়।

আগেই বলিয়াছি, এই বিবাহ একটি আশ্চর্য্য পরিণয়। ভাবুকের মনে ইহাতে হরগৌরীর দাম্পত্য মাধুর্য্য-চিত্র জাগরিত হয়। সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন একান্ত প্রীতিপূর্ণ এই যে দাম্পত্য প্রেম, জগৎ-সংসারে ইহার অনুরূপ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ইহা এমন সহজ ও সরলভাবপূর্ণ যে বিন্দুমাত্রও অস্বাভাবিকতা তাহাতে নাই। একবার মা পদব্রজে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন তখন পথ হারাইয়া পথে বিপন্না হইয়া দস্যুর ন্যায় বলিষ্ঠ ও ভীষণ আকৃতির এক অপরিচিত ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীর দেখা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন—সেইখানে আমি যাচ্ছি।" এই 'তোমার জামাই' কথাটিতে মায়ের সরল ও প্রীতিপূর্ণ মনের ভাবটি

কি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে! ঠাকুরের সেবার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে মায়ের কত আনন্দ! সব সময়ই নিতান্ত লজ্জাশীলা কুলবধূর ন্যায় অতি মৃদু আচরণ—যেন হ্রীর শোভন গুণ্ঠনে মা সর্ব্বদাই গুণ্ঠিতা, অথচ সঙ্কোচহীন সহজ ভাব। পথ ভুলিয়া জনশূন্য মাঠে বলিষ্ঠ ভীষণাকৃতি অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে মা যে ভাবে অতি সহজে "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি" এবং "তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন" বলিয়া তাহাকে এক কথাতেই পরমাত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন—অতি সাহসিকা কোন বয়োধিকাও তাহা পারেন কি-না সন্দেহ। অথচ মা নিতান্ত সরলা গ্রাম্য মেয়ে মাত্র। স্বামী-সন্দর্শনের আশায় অতিমাত্র আনন্দিতা হইয়া পথ চলিতেছেন, তাঁহার অনভ্যস্ত পথক্লেশে তাঁহাকে ক্লিষ্টা করিতে পারিতেছে না, কোন আশঙ্কাই তাঁহার মনে উদ্বেগের ছায়াপাত করিতে পারিতেছে না, আবার সকলের উপরেই তাঁহার আত্মীয়ভাব এবং সে আত্মীয়তার প্রভাব অতিক্রম করিবার মত শক্তি কাহারও আছে কি-না সন্দেহ।

মা সরলা, মা গ্রাম্য কুমারী, লেখাপড়াও শিখেন নাই। কত সময়ে মা যেন জগৎসংসারে কিছুই বুঝেন না, তাঁহার সরলতায় এমনিই মনে হইতে পারে, কিন্তু সেই সরলতার ভিতর গভীর গাম্ভীর্য্য অঙ্গাঙ্গিভাবে সন্নিবেশিত। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে একটি স্থান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—"দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানাটা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মন্দির

হইতে ফিরিলেন—একেবারে যেন পুরাদস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য্য করিতেছেন, ঠাকুর যে তাঁহার নিকট ঐ ভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় ঠাকুর মাতালের মত তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন, 'না, না, মদ খাবে কেন?' ঠাকুর—'তবে কেন টল্‌ছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি মাতাল?' শ্রীশ্রীমা—'না, না, তুমি মদ খাবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।' ঠাকুর 'ঠিক বলেছ' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

অন্যত্র আবার, ঠাকুর যখন পানিহাটীতে যাইবেন, মাও সঙ্গে যাইতে চাহেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়ের সঙ্গিনীরা যাইতে চাহিলেও মা যাইতে চাহিলেন না। ঠাকুর তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ও খুব বুদ্ধিমতী, যেতে চাইল না। গেলে পরে লোকে বোলতো—হংস-হংসী একত্রে এসেছে!" মা কেন যে যাইতে চাহিলেন না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "উনি আমি যাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 'আমার সঙ্গে যেতে হবে' এ কথা তো বলিলেন না। ইহাতেই আমার মনে হল—না যাওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমার সরল ভাবের বিষয়ে অতিশয় সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ঠাকুর যেমন গলার ব্যথা কিসে সারে ইহাকে-তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মাও সেইরূপ অসুখের সময় "কি অসুখ হল

বাপু, একি আর সারবে না মা! আমায় যে বিছানায় পেড়ে ফেললে। কি করি বল দেখি!" ইত্যাদি বলিতেছেন। আবার শশধর তর্কচূড়ামণি অসুস্থ স্থানে মানসিক শক্তিপ্রয়োগ করিয়া অসুখ সারাইবার কথা বলিতেই ঠাকুর যেমন "পণ্ডিত হয়ে ওকি কথা বল গো! যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তা কি আবার ফিরিয়ে এনে হাড়-মাসের খাঁচায় দেওয়া যায়?"—দৃঢ়ভাবে এই উত্তর দিয়াছেন, মাও তেমনি যদি কেহ অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছে, "আপনি একবার বলুন 'অসুখ সেরে যাবে,' তা হলে নিশ্চয়ই অসুখ সেরে যাবে।" তা হলে—"তা কি বলতে পারি? মা ঠাকুর যা করেন তাই তো হবে; আমি আর কি বলবো?" ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর পাওয়া যায় নাই। যদি কেহ জেদ করিয়া বলিয়াছে, "আপনি একবার মুখে বলুন, তা হলে নিশ্চয় অসুখ সেরে যাবে," তাহা হইলেও "আমি কি তা বলতে পারি? ঠাকুর যা করেন তাই হবে।"—তাঁর এই একই উত্তর ছিল।

তাঁহার ভালবাসা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে নব নব ভাবে বিভাবিত করিত। এক জনের একটি মাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তিনি মায়ের নিকট আসিয়া নিজের মনের তাপ জানাইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, শ্রীশ্রীমারও চোখে জল, মা বলিতেছেন, "আহা! তাই তো, একটি মাত্র সন্তান, প্রাণের ধন, এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কি করে প্রাণ ধরে বল দেখি?" আবার অপর একদিন এক জন যখন তাঁহার দুইটি সন্তানই সন্ন্যসী হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য লইয়াছে ইহা জননীর কাছে জানাইয়া বলিতেছেন, "মা, সন্তানের কল্যাণ হয় সেইটিই মায়ের কামনা। কি আছে সংসারে? ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথে যায় তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি আছে?" মা তখন সহর্ষে বলিতেছেন, "ঠিক বলেছ মা, পরম

কল্যাণের পথে যদি ছেলে যায়, তার চেয়ে আর মার আনন্দ কি হতে পারে?" এই যে বিভিন্ন স্থানে মায়ের বিভিন্ন ভাবের উক্তি উভয়ই তাঁহার আন্তরিক; একটিতে তিনি সন্তানহারা মায়ের দুঃখের সমঅংশিনী, আবার অপরটিতে মা যে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের বিষয় বুঝিয়াছেন ইহা দেখিয়া পরমানন্দিতা।

জননীর অনেক কন্যাই মনে করেন—মা আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, কখনও আমাকে ভুলেন না। অযোগ্যা এই দীনা লেখিকাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। মা অতি নিকটেই থাকিতেন, দর্শনের জন্য ইচ্ছাও যে প্রবল হইত না এমন নহে। কিন্তু সঙ্কোচ সব সময়েই বাধা দিত। তথাপি যখনই যতদিন পরেই মায়ের দর্শন পাইয়াছি তখনই মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছি—মা আমাকে একবারও ভুলেন নাই।

সেই অপারস্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার পিতৃহীনা দুঃখিনী স্নেহপাত্রী 'রাধু'র সকল অত্যাচার অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সকল সন্তানেরই অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে ইদানীং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; সে সময় হয়তো মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় বহুদূর হইতে দর্শনপ্রার্থী পথশ্রান্ত ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননী তখনই তাঁহার পরিচর্য্যার প্রয়োজনের জন্য বিশ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শত জনের শত আবদার—কেহ বা মায়ের হাতের অন্ন গ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না এই সঙ্কল্প করিয়াছেন, মা তখনই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন; কেহ বা ধূলিপায়ে মায়ের চরণপূজা করিয়া পরে প্রসাদান্ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আবদার ধরিয়াছেন, স্নেহময়ী সন্তানের

সে আবদারও পূরণ করিতেছেন। শত অবুঝ সন্তানের মায়ের উপর শত দাবী। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি করুণাময়ী জননী সকল প্রকারেই স্নেহ-সুধায় তাহাকে শান্ত করিতেছেন—মায়ের এই ছবি প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু আবার অনুরূপ দৃঢ়তারও অভাব ছিল না। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় একদিন একজন গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা মহিলা তাঁহার চরণদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মায়ের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। মা তখন খাটের উপর শুইয়াছিলেন। তিনি যেমন পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি মা যেন সন্ত্রস্তা হইয়া বলিলেন, "কর কি, কর কি, পায়ে হাত দিও না; গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী তুমি, পায়ে হাত দিয়ে কেন আমাকে অপরাধী কর?" মেয়েটি নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "অনেক আশা করে যে আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমায় দীক্ষা দেবেন বলে।"

মা বলিলেন, "ব্যস্ত হলে কি কিছু হয়, মা? সময় হলে নিজেই হবে। দীক্ষা কি তোমার হয় নি? গেরুয়া কে দিয়েছেন? যাঁর কাছে সাধন পেয়েছ, নিষ্ঠা করে তাঁকেই ধরে থাক, সময়ে হবে।"

মেয়েটি অবশেষে বলিলেন, "গেরুয়া কেহ দেন নাই, আমি নিজেই ধারণ করেছি। আর যে সাধন-প্রণালী পেয়েছি তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

মা তখন বলিলেন, "আজ আমি বড় অসুস্থ, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারলুম না বলে মনে দুঃখ কোরো না। কিন্তু মা, এটি মনে রেখো, গেরুয়া পরা খুব সহজ নয়। এই যে সব আশ্রমের ত্যাগী ছেলেরা ঠাকুরের জন্য সব ছেড়ে এসেছে, এরাই গেরুয়া পরার

অধিকারী। গেরুয়া পরা কি যার-তার কাজ?" এই সব বলিয়া মিষ্টি কথায় তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু মা তাঁহাকে পায়ের ধূলা নিতে দিলেন না।

মা অসুস্থা থাকিতেই তাঁহার জন্মতিথির দিন আসিল, সেদিন তাঁহার চরণপূজা করিতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। মা তখন খুব দুর্ব্বল, বার বার জ্বর হইতেছিল। মা পালঙ্কে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বসিয়া আছেন, শত শত ভক্ত চরণপূজা করিতে আসিতেছেন, মা সস্নেহে সকলের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ত্বরা সত্ত্বেও পূজায় বহু সময় লাগিল, কিন্তু মা সমভাবেই প্রসন্নময়ীরূপে সন্তানদের অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি আজও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ ভাষার তুলি দিয়া আঁকিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। আমি যখন মার দর্শন পাই নাই, আমার মেয়ে তখন নিবেদিতা স্কুলে পড়িত, তাহার কাছে প্রথম মায়ের প্রত্যক্ষ সংবাদ পাই। তার পূর্ব্বে কেবল মনে কল্পনা লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম। আমার মেয়ে প্রথম আসিয়া আমাকে তাঁহার প্রত্যক্ষ সংবাদ জানাইল। সে বলিল, "মা, মাকে আমরা দর্শন করতে গিয়েছিলুম, তিনি যে কত সুন্দর, কত ভাল, তুমি দেখলে বুঝতে পারবে। আমার এত ভাল লেগেছে মা, সে আর কি বলবো। কেবলি মনে হচ্ছিল, তুমি যদি একবারটি তাঁকে দেখতে।" তাহার এই কথা শুনিয়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার কাছে মায়ের মধুর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলাম। সেও আনন্দের সহিত বলিল—কেমন তিনি খাইতে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বালিকাদের সম্ভাষণ করিতেছিলেন, অল্পাহারের জন্য গোলাপ-মার কাছে তিরস্কৃতা হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন, সকলকে তাঁহার প্রসাদ কত স্নেহের সঙ্গে

হাতে হাতে ভাগ করিয়া দিতেছিলেন। সেই ছবিটি যেন তাহার বর্ণনায় মনের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহার কাছে মায়ের কথা প্রত্যহ শুনিতে পাইতাম, আর মনে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিত; কেবল মনে হইত—সবাইকে আপন করে নিয়ে আমায় কেন এত দূরে রেখেছেন? অবশেষে একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মায়ের দর্শন পাইলাম।

আজ তিনি দুর্লভ, তিনি ধ্যানগম্য। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় চিন্ময়ী জননী মৃন্ময় ঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, জড় দৃষ্টি আজ তাঁহার দর্শনের অধিকার হারাইয়াছে, কিন্তু জগৎ তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া কি সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই অনুভব করিবার আজ সময় আসিয়াছে।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী

সারদামণি দেবী

শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রসংশা আছে, সন্ন্যাসীরও প্রশংসা আছে। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায় যে, গার্হস্থ্য আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। কিন্তু গৃহস্থমাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নহে, সন্ন্যাসী মাত্রেরও জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ নহে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভগবদ্দত্ত শক্তি, হৃদয়-মনের গতি প্রভৃতির দ্বারা স্থির হয় যে, ভগবান কিরূপ জীবন যাপন করিয়া কি কাজ করিবার নিমিত্ত কাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। যিনি যে আশ্রমে আছেন, তদুচিত জীবন যাপন করেন কি-না, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি অনুভব করিতে পারেন। যিনি যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি দেখিয়া তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, সার্থকতা-ব্যর্থতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারা হয় কখনও বিবাহই করেন নাই, কিংবা বিবাহ করিয়া থাকিলে পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে যখন তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, কিংবা তাঁহার অনভিমতে কেহ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে

হইয়াছিল—তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, তাঁহারই নির্দ্দেশ-অনুসারে পাত্রীনির্ব্বাচন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন পত্নীকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখন কোন দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্য দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই; বরং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ, উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে নিজের সহধর্ম্মিণীর মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাঁহার পত্নী সারদামণি দেবীরও বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। একই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র ত অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটীর তাল হইতে তেমন হয় না।

এইজন্য সারদামণি দেবীর জীবন-কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবন-চরিত নাই। পরমহংসদেবের জীবন-চরিতে প্রসঙ্গক্রমে সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে, তাহা দ্বারাই কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে হয়। সম্ভব হইলে, রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্ত-দিগের মধ্যে কেহ এই মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। হয় ত একাধিক জীবন-চরিত লিখিত হইবে। তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্র ভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না। রামকৃষ্ণের

এইরূপ একটি জীবন-চরিতের প্রয়োজন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগের রামকৃষ্ণ ও সারদা-মণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। মণ্ডলীভুক্ত ভক্তদিগের জন্য অবশ্য অন্যবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পারে।

গৃহস্থাশ্রমে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। "সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মনাভাব দূর করিবার জন্য" তাঁহার "স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করেন।"

"গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর-আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই; বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।"

চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সন্ধান বলিয়া দেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, সন্ধান মিলিল। অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া * একমাত্র কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। বিবাহে তিনশত টাকা পণ লাগিল। তখন গদাধরের বয়স তেইশ পূর্ণ হইয়া চব্বিশে চলিতেছে।

* তখন কন্যার "বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র।"
—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব' (বিবাহ ও পুনরাগমন)

গদাধরের মাতা চন্দ্রাদেবী "বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য জমিদার বন্ধু লাহা বাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকদিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহার কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, 'আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?' চন্দ্রাদেবী সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, 'মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে।'"

চন্দ্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে না হইলেও অন্য অর্থে ভবিষ্যৎকালে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

"এইখানেই কিন্তু এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'উহারা এখন যাহাই বলুক করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না'।"

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথা-অনুসারে স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর বহু বৎসর রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ছিলেন না। ১২৭৪ সালে তিনি যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত কামারপুকুরে আবার আগমন করেন।

বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাট-বাজার বসিল এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দ্দেশে জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। বিবাহের পর সারদামণি একবার মাত্র স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎরের বালিকা মাত্র। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কেবল এইটুকু মনে ছিল যে, ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী আসিলে বাড়ীর কোন নিভৃত অংশে লুকাইয়াও তিনি রক্ষা পান নাই। হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পা পূজা করিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি একমাস ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে আবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দেড় মাস ছিলেন। তখন স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই। তাহার তিন-চার মাস পর যখন তিনি বাপের বাড়ীতে ছিলেন তখন খবর আসিল রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুর যাইতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর ছয়-সাত মাস।

রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবান হইলেন।

পত্নীর তাঁহার নিকট আসা-না-আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদাসীন থাকিলেও যখন সারদামণি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইলেন।

রামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়া "শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, 'তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে'।"

তোতাপুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-লব্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোন কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল।

"ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন না। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্ম্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।"

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্বভাবতঃই নিতান্ত বালিকা-স্বভাবসম্পন্না ছিলেন। "কামারপুকুর-অঞ্চলের

বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন কলিকাতা-অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম-সকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ুসেবন এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা স্বচ্ছন্দ বিহারপূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।"

পবিত্রা বালিকা রামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদরযত্ন-লাভে ঐ কালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

"হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে—ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে!"

কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, সারদামণি তখন অত্যন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

"উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্তসমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক-উল্লাস-প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।"

কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন স্বামীর পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সম্বরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন; ভাবিতেন প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন।

"ঐরূপ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশাপ্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম-সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়' ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন—পরে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।"

ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে সারদামণি

দেবীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া এই বৎসর গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসা স্থির করেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার পিতাকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি কন্যার এখন কলিকাতা যাইবার অভিলাষের কারণ বুঝিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা রেলে আসা যাইত না, সুতরাং পাল্কীতে কিংবা পদব্রজে আসা ভিন্ন উপায় ছিল না। ধনী লোকেরা ভিন্ন অন্য সকলকে হাঁটিয়াই আসিতে হইত। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাঁটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

"ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা সকলে প্রথম দুই দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথি-মধ্যে এক স্থানে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কন্যারও তাহাতে মত হইল, কিছুদূর যাইতে না যাইতে একটি পাল্কীও পাওয়া গেল। সারদামণি দেবীর আবার জ্বর আসিল। কিন্তু আগেকার মত জোরে না আসায় তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন না এবং ঐ বিষয় কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। রাত্রি নয়টার সময় সকলে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন।

সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

"ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজগৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন।"

ঐ তিন-চারি দিন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দিনরাত নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবত-ঘরে নিজ জননীর নিকট তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সারদামণি এখন বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণা পূর্ব্ববৎ আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে পরমহংসদেব ও তাঁহার জননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন। তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশ দেওয়াতেই রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবসিত হইত না। তিনি শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া, ভালবাসায়

সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন; পরে শিষ্য উহা কাজে কতদূর পালন করিতেছে, সর্ব্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রম-বশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। সারদামণির সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের এরূপ নজর ছিল যে, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠ্‌বে, আর নামবার সময় কোনও জিনিস নিতে ভুল হয়েছে কি-না, দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।"

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সত্য দেখিতে পাই।" রামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে—অতি হীনচরিত্রা রমণীর মধ্যেও বিশ্বের জননীকে দেখিতেন।

"উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন—পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই, পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।" —(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪র্থ ব্রাহ্মণ)।

এই সময় রামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিতেন। দেহ-বোধ-বিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে সারদামণি

দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্যা না হইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের "দেহ-বুদ্ধি আসিত কি-না, কে বলিতে পারে?" পৃথিবীর নানা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের পত্নীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাঁহারা উহাদের সহায় হইয়া উহাদের জীবন-পথ সর্ব্ববিধ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে, উহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। অনেক মহান্ লোকের পত্নী কেবল যে পতিকে সংসারের খুঁটিনাটি ও নানা ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি দেন তা নয়, অবসাদ নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময় তাঁহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্ত্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্ত্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে এক-ক্ষণের জন্যও দেহ-বুদ্ধির উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে কখন জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শীপূজার আয়োজন করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্ব্বক পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষদিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

ইহার পরও তিনি অহঙ্কৃতা হন নাই, তাঁহার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া যায় নাই।

ষোড়শীপূজার পর তিনি প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেলা নহবৎ-ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও রন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য হইত না বলিয়া অনেক সময়েই তাঁহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত। সেই সময় দিবারাত্র রামকৃষ্ণের "ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না" এবং কখন কখন "মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত।" কখন রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় সারদামণির রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। এই কারণে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া রামকৃষ্ণ নহবত-ঘরে নিজের মাতার নিকটে তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর চারি মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সারদামণি দেবী সম্ভবতঃ ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন।

তখনকার কথা স্মরণ করিয়া সারদামণি দেবী উত্তরকালে স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেন :

"সে যে কি অপূর্ব্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব-আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাব-সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে, ভয়ে কেঁদে-কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তার পর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি

নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হোত না, ও সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হোত।"

সারদামণি দেবী বলিতেন—

"এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্ত্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।"

কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শনে আসিয়া নহবতখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত ইঁহাদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন। কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া আবার রান্না চড়াইতে হইত।

একবার পাণিহাটীর মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ জনৈক স্ত্রীভক্তের দ্বারা সারদামণি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাইবেন কি-না—"তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক।" সারদামণি দেবী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।" তাঁহার এই না যাওয়ার সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া পরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "অত ভিড়—তাহার উপর ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল, ও (সারদামণি) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত—'হংস-হংসী এসেছে'।

ও খুব বুদ্ধিমতী।" তার পর পত্নীর বুদ্ধির ও নির্লোভিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন—

"মাড়োয়ারী ভক্ত (লছ্‌মীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল, তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি!' সেই সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম,—'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লওনা কেন? কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না—আমি লইলে, ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ আমি উহা রাখিলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে তোমার ত্যাগের জন্য। অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।"

যাঁহাকে দরিদ্রতাবশতঃ বিপৎ-সঙ্কুল দুই-তিন দিনের পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইতে হইত, ইহা সেইরূপ অবস্থার নারীর নিস্পৃহতার সুবিবেচনারও অন্যতম দৃষ্টান্ত।

"সারদামণি দেবী পাণিহাটীর মহোৎসব দেখিতে না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'প্রাতে উনি আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, উনি মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—'হাঁ, যাবে বই কি।' ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক', তখন স্থির করিলাম যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

সারদামণি দেবী বাঙ্গালী হিন্দুকুলবধূ, সুতরাং সাতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবৎখানায় তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় আত্মনিয়োগ-

করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অল্প লোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি যে ঘরে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আর বাহিরে আসিতেন না, কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে নীরবে নিঃশব্দে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্তা হইতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপর শয়ন করিয়াছিল। তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না। এইরূপে স্বভাব ও অভ্যাস সত্ত্বেও স্বামীর কঠিন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে অবস্থানের সময় "এক মহল বাটীতে অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" "ডাক্তারের উপদেশ মত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র সারদামণি দেবী আপনার থাকিবার সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে থাকিয়া সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি তখনও রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং রাত্রি এগারটার পর মাত্র দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। হিন্দু কুলবধূ হইলেও তিনি প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বসংস্কার ও অভ্যাসের

বাধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত যথাযথ আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে সেকালে সারদামণি দেবী অনেক সময়ে জয়রামবাটী ও কামার-পুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বর হাঁটিয়া আসিতেন। আসিতে হইলে পথিকগণকে চার-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন নরহন্তা ডাকাইতদের ঘাটি ছিল। প্রান্তরের মধ্যভাগে এখনও এক ভীষণ কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'তেলোভেলোর ডাকাতে-কালীর' পূজা করিয়া ডাকাতরা নরহত্যা ও দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে লোকে দলবদ্ধ না হইয়া এই দুটা প্রান্তর অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

একবার রামকৃষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিত সারদামণি দেবী পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলো ও কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তা থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি না করিয়া তাঁহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বরাবর আগাইয়া গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে আসিলে আবার চলিতে লাগিলেন। শেষবার তাঁহারা বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না এবং সকলকে ডাকাইতের হাতে পড়িতে হইবে। এতগুলি

লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।" তাহাতে সঙ্গীরা বেলা বেশী নাই দেখিয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও ক্লান্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছু পরেই সন্ধ্যা হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাঁধে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহার পিছনেও তাহার সঙ্গীর মত কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। পলায়ন বা চীৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাঁহার কাছে আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?" সারদামণি বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তাঁহার নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তা হলে তিনি তোমার খুব আদরযত্ন করবেন।" এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটিও তথায় আসিয়া পৌঁছিল এবং সারদামণি দেবী দেখিলেন সে স্ত্রীলোক, পুরুষটির পত্নী। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম;

ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতাম বলতে পারি নে।"

সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলিয়া সত্য-সত্যই তাঁহাকে আপনাদের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিল এবং তিনি ক্লান্তা বলিয়া আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিল এবং পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। এইরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বর পৌঁছিল। সেখানে এক দোকানে তাঁহাকে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বাগ্‌দিনী তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায় নি, বাবা তারকনাথের পূজা শীঘ্র সেরে বাজার হতে মাছ তরকারি নিয়ে এস; আজ তাকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।"

বাগ্‌দি পুরুষটি ঐ সব করিবার জন্য চলিয়া গেলে সারদামণি দেবীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা বাগ্‌দি পিতামাতার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "এরা এসে আমাকে রক্ষা না করিলে কাল রাত্রে যে কি করতুম, বলতে পারি না।"

তাহার পর সকলে আবার পথ চলা আরম্ভ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলে সারদামণি দেবী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনাম করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায়গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কড়াই-শুটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি তখন এইগুলি দিয়ে খাস।' পূর্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। নানাবিধ দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এমন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত বাবা পূর্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল, এ কথা কিন্তু আমার মনে হয়।"

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বৎসর। আমি শুনিয়াছিলাম, স্বামীর তিরোভাবে সারদামণি দেবী বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য কিনা জানিবার জন্ম পরমহংসদেবের ও সারদামণি দেবীর একজন ভক্তকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছেন :

"শ্রীশ্রীমৎ পরমহংসদেবের দেহরক্ষার সময় মা হাতের বালা খুলিতে গেলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব জীবিত অবস্থায় রোগহীন শরীরে যেমন দেখিতেছিলেন, সেই মূর্ত্তিতে আসিয়া মার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—আমি কি মরিয়াছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত হইতে

খুলিতেছে ? এই কথার পর আর মা কখন শুধু হাতে থাকেন নাই—পরিধানে লাল নরুন-পেড়ে কাপড় এবং হাতে বালা ছিল।"

আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারে অনেক দুঃখ পাপ তাপ ও দুর্গতি দূর হয়।

স্বামীর তিরোভাবের পর সারদামণি দেবী ৩৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তাহার পরবর্ত্তী ভাদ্রমাসের 'উদ্বোধন'পত্রে তাঁহার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবা-পরায়ণতা, দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁহার সরলতা, নিরভিমানিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামীর ও তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন এবং এখনও মা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করেন। এই মাতৃসম্বোধন সার্থক হউক।

[সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত-রচনা আমার পক্ষে নানা কারণে সহজ হয় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করিবার ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনও না হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে আমাকে তাঁহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' আমার প্রধান অবলম্বন। ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য অনেক স্থলেও ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। 'উদ্বোধন' হইতেও কিছু সাহায্য পাইয়াছি। ইহার দুটি প্রবন্ধে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার নানা গুণের বন্দনা আছে। যে-সকল

কথায়, কাজে, ঘটনায়, আখ্যায়িকায় ঐ সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় এমন কোনও কথা, কাজ, ঘটনা, আখ্যায়িকা তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ব্যতীত সারদামণি দেবীর যে-সকল ফটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছি, সেইগুলির এবং কয়েকটি সংবাদের জন্যও আমি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। তাঁহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩১) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

প্রথম দর্শন—১৩১৭

কলিকাতা পটলডাঙ্গার বাসায় শুক্রবার সকালে শ্রীমান্— বলে গেল, "কাল শনিবার মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে যাব; আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন।" কাল তবে মায়ের দর্শন পাব! সারা রাত আমার ঘুমই এল না। আজ ১৩১৭ সন, প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর হয়ে গেল কলিকাতায় আছি, এত কাল পরে মায়ের দয়া হল কি? এত দিনে কি সুযোগ মিলিল? পরদিন বৈকালে গাড়ী করে সুমতিকে ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় হতে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে চললুম। কি আকুল আগ্রহে গিয়েছিলুম, তা ব্যক্ত করবার ভাষা জানি না! গিয়ে দেখি মা বাগবাজারে তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পা চৌকাঠের উপর, অপর পা পাপোশখানির ওধারে; মাথায় কাপড় নেই, বাঁ হাতখানি উঁচু করে দরজার উপর রেখেছেন, ডান হাতখানি নীচুতে, গায়েরও অর্দ্ধাংশে কাপড় নেই, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম

করতেই পরিচয় নিলেন। সুমতি বললে, "আমার দিদি।" সে পূর্ব্বে কয়দিন গিয়েছিল; তখন মা একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই দেখ মা, এদের নিয়ে কি বিপদে পড়েছি! ভাই-এর বউ, ভাইঝি, রাধু, সব জ্বরে পড়ে। কে দেখে, কে কাছে বসে, ঠিক নেই। বস, আমি কাপড় কেচে আসি।" আমরা বসলুম। কাপড় কেচে এসে দুই হাত ভরে জিলিপি-প্রসাদ এনে দিয়ে বললেন, "বৌমাকে (সুমতি) দাও, তুমিও নাও।" সুমতিকে শীঘ্র স্কুলে ফিরতে হবে, তাই সে দিন একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় নিলুম। মা বললেন, "আবার এস।" এই পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা, আশা মিটল না। অতৃপ্ত প্রাণে বাসায় ফিরলুম।

৩০শে মাঘ, ১৩১৭

শ্রীশ্রীমা সে দিন বলরাম বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতেই মা ফিরলেন। প্রণাম করে উঠতেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে এসেছ?"

আমি বললুম, "আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে।"

মা—ভাল আছ? বৌমা ভাল আছে? এত দিন আস নি—ভাবছিলুম অসুখ করল না-কি।"

বিস্মিত হয়ে ভাবলুম—একদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের দেখা, তাতে মা আমাদের কথা মনে করেছেন! ভেবে আনন্দে চোখে জলও এল।

মা—(আমার পানে সস্নেহে চেয়ে) তুমি এসেছ, তাই ওখানে (বলরাম বাবুর বাড়ীতে) বসে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

মায়ের একটি শিশু ভাইপোর (ক্ষুদের) জন্য সুমতি তুটি পশমের টুপি দিয়েছিল; মাকে উহা দিতে এই সামান্য জিনিসের জন্য কতই খুশি হলেন। তক্তাপোষের উপর বসে বললেন, "বস এখানে, আমার কাছে।" পাশেই বসলুম, মা আদর করে বললেন, "তোমাকে যেন মা, আরও কত দেখেছি—যেন কত দিনের জানাশোনা।"

আমি বললুম, "কি জানি মা, এক দিন ত কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছিলুম।"

মা হাস্‌তে লাগলেন ও আমাদের তুই বোনের অনুরাগ-ভক্তির অনেক প্রশংসা করলেন। আমরা কিন্তু ঐ সকল কথার কতদূর যোগ্য তাহা জানি না। ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রী-ভক্ত আসতে লাগলেন। ভক্তি-বিগলিত চিত্তে সকলেই মায়ের হাসিমাখা স্নেহভরা মুখখানির পানে

একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, ওরূপ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নি। মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছি, এমন সময় বাসায় ফিরবার তাগিদ এল—গাড়ী এসেছে। মা তখন উঠে প্রসাদ নিয়ে "খাও খাও" করে একেবারে মুখের কাছে ধরলেন। অত লোকের মধ্যে একলা অমন করে খেতে আমার লজ্জা হচ্ছে দেখে বললেন, "লজ্জা কি? নাও।" তখন হাত পেতে নিলুম। "তবে আসি, মা" বলে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় বললেন, "এস মা, এস, আবার এস। একলা নেমে যেতে পারবে ত? আমি আসব?" ইহা বলে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এলেন। তখন আমি বললুম, "আমি যেতে পারব, মা। আপনি আর আসবেন না।" মা তাই শুনে বললেন, "আচ্ছা, একদিন সকালে এস।" পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরলুম। ভাবলুম—এ কি অদ্ভুত স্নেহ!

বৈশাখ-সংক্রান্তি, ১৩১৮

আজ গিয়ে প্রণাম করতেই মা বললেন, "এসেছ মা, আমি মনে করছি কি হল গো, কেন আসে না। এতদিন আস নি কেন?"

আমি বললুম, "এখানে ছিলুম না মা, বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম।"

মা—বৌমা (সুমতি) আসে না কেন? পড়াশুনার চাপে?

আমি—না, ভগ্নীপতি এখানে ছিলেন না।

মা—তা, ও ত ইস্কুলে যাচ্ছে; আচ্ছা, ওরা সংসার-ধর্ম্ম করে ত?

আমি বললুম, "কাকে বলে সংসার, কাকে বা বলে ধর্ম্ম, তা কি জানি মা—আপনিই জানেন।" মা একটু হাসলেন।

মা 'কি গরম পড়েছে!' বলে বাতাস খেতে পাখাখানা হাতে দিয়ে বললেন, "আহা, দুটো ভাত খেয়েই ছুটে আসছ—এখন আমার কাছে একটু শোও।"

মাকে নীচে মাদুর পেতে দিয়েছে। তাঁর বিছানায় শুতে সঙ্কুচিত হচ্ছি দেখে বললেন, "তাতে কি মা শোও, আমি বলছি শোও।" অগত্যা শুলুম। মার একটু তন্দ্রা আসছে দেখে চুপ করে আছি। এমন সময় প্রথমে দুই-একটি স্ত্রী-ভক্ত এবং শেষে দুজন সন্ন্যাসিনী এলেন। একজন প্রৌঢ়া, অপরটি যুবতী। মা চোখ বুজেই বলছেন, "কে গো, গৌরদাসী এলে?"

যুবতী বললেন, "আপনি কি করে জানলেন, মা?"

মা বললেন, "টের পেয়েছি।" কিছুক্ষণ পরে উঠে বসলেন।

যুবতী বললেন, "বেলুড় মঠে গিয়েছিলুম। প্রেমানন্দ স্বামিজী খুব খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি থাকলে ত না খেয়ে ফিরবার উপায় নেই।" যুবতী সিন্দূর পরেন নি দেখে মা তাঁকে একটু বকলেন।

পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার পরিচয় নিয়ে গৌরী-মা একদিন তাঁদের আশ্রমে আমাকে যেতে বলে বললেন, "সেখানে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তুমি সেলাই জান?" আমি "সামান্য কিছু জানি" বলাতে তিনি তাঁর আশ্রমের মেয়েদের তাই শিখিয়ে আসতে বললেন।

মায়ের আদেশ নিয়ে গৌরীমার আশ্রমে একদিন গেলুম। তিনি খুব স্নেহ-যত্ন করলেন এবং প্রত্যহ দুই-এক ঘণ্টা করে এসে মেয়েদের পড়িয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি বললুম, "এই সামান্য শিক্ষা নিয়ে শিক্ষয়িত্রী হওয়া বিড়ম্বনা। ক, খ পড়াতে বলেন ত পারি।" গৌরীমা কিন্তু একেবারে নাছোড়। অগত্যা স্বীকৃত হয়ে আসতে হল।

একদিন স্কুলের ছুটি হলে গৌরীমার আশ্রম হতে মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে গেলুম। গ্রীষ্মকাল। সেদিন একটু পরিশ্রান্তও হয়েছিলুম। দেখি, মা এক-ঘর স্ত্রী-ভক্তের মধ্যে বসে আছেন। আমি গিয়ে প্রণাম

করতেই মুখ পানে চেয়ে মশারির উপর হতে তাড়াতাড়ি পাখাখানি নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শীগ্গির গায়ের জামা খুলে ফেল, গায়ে হাওয়া লাগুক।" কি অপূর্ব্ব স্নেহ-ভালবাসা! অত লোকের মধ্যে এত আদর-যত্ন! আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল—সবাই চেয়ে দেখেছিল; মা নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছেন দেখে জামা খুলতেই হল। আমি যত বলি, "পাখা আমাকে দিন্, আমি বাতাস খাচ্ছি", ততই স্নেহ-ভরে বলতে লাগলেন, "তা হোক, হোক; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।" তারপর প্রসাদ ও এক গ্লাস জল এনে খাইয়ে তবে শান্ত হলেন! স্কুলের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে তাই দু-একটি কথা কয়েই সেদিন ফিরতে হল।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৮

আজ সকালে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষায় গেলুম। কি কি দ্রব্যের দরকার হয়, তা গৌরীমার নিকট জেনে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের বাড়ী গিয়ে দেখি—মা তদ্গতচিত্তে ঠাকুরপূজা করছেন, আমরা যাবার একটু পরে চেয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। পূজাশেষ হলে গৌরীমা আমার দীক্ষার কথা বললেন। পূর্ব্বে মার সঙ্গে একদিন

আমারও ঐ বিষয়ে কথা হয়েছিল। মর্ত্তমান কলা নিয়ে গেছি মা দেখে বললেন, "এই যে মর্ত্তমান কলা এনেছে। (এক জন সাধুর নাম করে) সে কলা খেতে চেয়েছিল, বেশ করেছ।" পরে বললেন, "ঐ আসনখানা নিয়ে আমার বাঁ দিকে এসে বস।"

আমি বললুম, "গঙ্গাস্নান ত করা হয় নি।"

মা—তা হোক। কাপড়চোপড় ত ছেড়ে এসেছ?

কাছে বসলুম। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। মা তখন ঘর হতে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বপ্নে কি পেয়েছ বল।"

আমি বললুম, "লিখে দেব, না মুখে বলব?"

মা—মুখেই বল। * * *

দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীমা স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ বলে দিলেন। বললেন, "আগে ঐটি জপ করবে।" পরে তিনি আর একটি বলে দিয়ে বললেন, "শেষে এইটি জপ ও ধ্যান করবে।"

মন্ত্রটির অর্থ বলবার পূর্ব্বে মাকে কয়েক মিনিটের জন্য ধ্যানস্থ হতে দেখেছিলুম। মন্ত্র দেবার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল এবং কেন বলতে পারি না, কাঁদতে লাগলুম। মা কপালে বড় করে একটা রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন। দক্ষিণা ও ঠাকুরের

ভোগের জন্য কিছু টাকা দিলুম। শ্রীশ্রীমা পরে গোলাপ-মাকে ডেকে ভোগের টাকা তাঁর হাতে দিলেন।

দীক্ষার সময় মাকে খুব গম্ভীর দেখলুম। পরে পূজার আসন হতে মা উঠে গেলেন। আমাকে বললেন, "তুমি খানিক ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা কর।" আমি ঐরূপ করবার পরে উঠে মাকে প্রণাম করতেই মা আশীর্ব্বাদ করলেন—"ভক্তি লাভ হোক।" মনে মনে মাকে বললুম, "দেখো মা, তোমার কথা মনে রেখো, ফাঁকি দিও না যেন।"

শ্রীশ্রীমা এইবার গঙ্গাস্নানে যাবেন—গোলাপ-মা সঙ্গে। আমিও মায়ের কাপড়-গামছা নিয়ে সঙ্গে গেলুম। স্নানের জন্য মা গঙ্গায় নেমেছেন, এমন সময় অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হল। স্নান করে উঠে ঘাটের পাণ্ডা-ব্রাহ্মণকে একটি কলা, একটি আম ও একটি পয়সা দিয়ে মা বললেন, "ফল আমি দিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার।" হায়! পাণ্ডাঠাকুর, জান না কার হাতের দান আজ পেলে! আর কত বড় কথা শুনলে! কোটি কামনায় জড়িত মানুষ আমরা ঐ দেববাণীর মর্ম্ম কি বুঝব!

আমার কাছ থেকে কাপড়খানি নিয়ে, পরে ভিজে কাপড়খানি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন, "চল।"

গোলাপ-মা আগে, মা মাঝে, আমি পেছনে চললুম। ছোট একটি ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে মা রাস্তার ধারে প্রতি বটবৃক্ষে জল দিয়ে প্রণাম করে যেতে লাগলেন। মা তখন রাজার ঘাটে স্নান করতেন। কারণ, নূতন ঘাট (দুর্গাচরণ মুখার্জীর ঘাট) তখনও হয়নি। গোলাপ-মা ছোট একটি ঘড়ায় গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন, বাড়ীতে ফিরে উহা ঠাকুরঘরে রাখতে গেলেন। নীচের কল-তলায় চৌবাচ্চার কাছে একটা ঘটিতে জল ছিল, মা তাই দিয়ে পা ধুয়ে আমায় বললেন, "কাদা লেগেছে, ধুয়ে এস।" আমি জল খুঁজছি দেখে বললেন, "ঐ ঘটির জলেই ধোও না।"

আমি বললুম, "আপনি যে ও জল ছুঁয়েছেন।"

মা—আগে একটু মাথায় দিয়ে নাও, তা হলেই হবে।

আমার কিন্তু মন সরল নয়, বললুম, "তা কি হয়?" আমি আর একটা পাত্র এনে চৌবাচ্চা হতে জল নিয়ে পা ধুয়ে নিলুম। মা ততক্ষণ আমার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর উপরে গিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ দুখানি শালপাতায় সাজিয়ে নিজে একখানি নিলেন এবং আমাকে একখানি দিয়ে কাছে বসে খেতে বললেন। আমি প্রসাদ পাবার পূর্ব্বে মায়ের চরণামৃত পাবার আকাঙ্ক্ষা জানাতে মা

বললেন, "তবে জালা হতে একটু কলের জল নিয়ে এস" এবং আমি উহা আনলে পাত্রটি আমাকে হাতে করে ধরে রাখতে বলে নিজে বাম ও দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জলে দিয়ে কি বলতে লাগলেন—বুঝতে পারলুম না, শুধু ঠোঁট নড়তে দেখলুম। শেষে বললেন, "নাও, এখন।" আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে উহা পান করলুম। তারপর খেতে খেতে প্রত্যেক জিনিসটি নিজে এক একটু খেয়ে আমার পাতে দিতে লাগলেন।

ক্রমে অনেকগুলি স্ত্রী-ভক্তের আগমন হল। কাউকেই চিনি না। শুনলুম—তাঁরা সকলেই এখানে প্রসাদ পাবেন। ঠাকুরের ভোগের পর আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মাও তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। তিনবার অন্ন মুখে দিয়ে মা আমাকে ডাকলেন এবং আমার হাতে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করলুম। কি যে একটি সুগন্ধ পেলুম এখনও সেকথা ভাবলে অবাক হই। তারপর একে একে সকলের পাতেই মার প্রসাদ বিতরিত হল। গোলাপ-মা সকলকে দিয়ে শেষে নিজে খেতে বসলেন। মা এইবার খুব হাসিখুশি গল্প-সল্প করতে করতে খেতে লাগলেন। তাই দেখে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। দীক্ষার সময় হতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে যেন আর এক মা মনে হচ্ছিল। সে কি গম্ভীর,

অন্তর্মুখী, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থা দেবীমূর্ত্তি! 'ভয়ে জড়সড় হয়েছিলুম। পরে কত লোককে দীক্ষা দিতে দেখেছি, দু-চার মিনিটেই হয়ে গেছে, কিন্তু সেরূপ গম্ভীর ভাব তাঁর আর কখন দেখি নি। কত জনকে হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে বা বসে দীক্ষা দিয়েছেন। তারা খুশি হয়ে তখনই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কাউকে বা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছি, "দীক্ষার সময় মায়ের কেমন রূপ দেখলেন?" একটি বিধবা স্ত্রী-ভক্ত আমার ঐ প্রশ্নে বলেছিলেন, "এই এম্নিই। আমি পূর্ব্বে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম—পরে মায়ের কথা শুনে এখানে দীক্ষা নিতে এসেছি। পূর্ব্বে কুলগুরু যেটি দিয়েছেন, মা আমাকে সেটি রোজ প্রথমে দশবার জপ করে নিতে বললেন—পরে নিজে যে দিয়েছেন সেটি দিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি গুরু, (অন্য এক মূর্ত্তি দেখিয়ে) আর ইনি ইষ্ট,' আর এই বলে প্রার্থনা করতে বললেন যে 'ঠাকুর, আমার পূর্ব্বজন্মের, ইহজন্মের কুকর্ম্মের ভার তুমি নাও' ইত্যাদি। আমার কি হয়েছে বলুন ত, যখনই জপ করতে বসি, আধ ঘণ্টার বেশী জপ করতে পারি নে, কে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়। আপনাদের এমন হয়? ভাবি মার কাছে কত কথা বলি—কিছুই বলতে পারি নে। আপনারা ত বেশ মায়ের সঙ্গে কথা

বলতে পারেন। মা কি আমাকে ফাঁকি দিলেন?” আমি কিন্তু অত কথা জানিতে চাই নি, স্ত্রীলোকটির প্রায় প্রৌঢ়াবস্থা—সরল ভাবেই নিজেই বলে যাচ্ছেন। আমি বললুম, “যা আপনার ইচ্ছা হবে মায়ের কাছে বলুন না, দু-চার দিন বলতে বলতে সহজ হয়ে আসবে। আমরাও প্রথম প্রথম অত কথা বলতে পারি নি। এখনও এক এক সময় এমন গম্ভীরভাব ধারণ করেন, কাছেই এগুনো যায় না।”

বেলা পড়ে আসতে সমাগত ভক্ত-মহিলাগণ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিতে লাগলেন, কেহ বা আরতি দেখে যাবেন বললেন, শ্রীশ্রীমা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিয়ে প্রত্যেককে প্রসাদ দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। মা রাধু, মাকু প্রভৃতিকে ঠাকুর ঘরে এসে জপ করতে বসতে বললেন। তারা আসতে বিলম্ব করায় মা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, “সন্ধ্যার সময় এখন এসে সব জপ টপ করবে, না কোথায় কি করছে দেখ।” একটু পরে তারা এসে জপ করতে বসল।

পূজনীয়া গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি এসে সন্ধ্যাকালে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন,

মা তাঁদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। কারও বা চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেলেন, আবার হাত জোড় করে নমস্কারও করলেন। তারপর ঠাকুরপ্রণাম করে একখানি আসন পেতে জপে বসলেন। সন্ধ্যারতির উদ্যোগ হচ্ছে, শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ পরে জপ শেষ করে উঠলেন। বাসা হতে একটি ছেলে নিতে এসেছে, মায়ের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, "মা, কৈ সেদিনকার সেই কাপড়খানি ত পরলেন না?"

মা বললেন, "তাই ত মা, তখন মনে করে দিলে কৈ?" প্রণাম করে বাসায় ফিরলুম।

স্কুলের কাজের জন্য শীঘ্র আর মায়ের কাছে যেতে সময় পাই নি। অনেকদিন পরে আজ আবার মায়ের পদপ্রান্তে গিয়ে বসতেই মা কত আদর করতে লাগলেন। ভূদেব মহাভারত পড়ছিল। ছেলে মানুষ, পড়তে দেরি হচ্ছিল, মাকে এখন শীঘ্র উঠতে হবে, কারণ প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেজন্য তিনি ভূদেবকে বললেন, "একে দে, এ জলের মত পড়ে দেবে এখন, এ অধ্যায় শেষ না করে ত উঠতে পারব না।" মায়ের আদেশে মহাভারত পড়তে বসলুম। এর পূর্ব্বে আর কখনও মায়ের কাছে পড়ি নি। কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। যা হোক্, কোন প্রকারে অধ্যায় শেষ হল। মহাভারতকে মা

হাতজোর করে, প্রণাম করে উঠে পড়লেন এবং আমরা সকলে ঠাকুরঘরে আরতি দেখতে গেলুম। মা নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে জপে বসলেন।

জপান্তে হরিবোল হরিবোল করে উঠে ঠাকুর প্রণাম করে সকলকে প্রসাদ দিলেন। কথায় কথায় কর্ম্মের কথা উঠল। মা বললেন, "সর্ব্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রাম-বাটী ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম। কোথাও কারো বাড়ী যেতুম না। গেলেই লোকে বলত, 'ও মা, শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাই-এর সঙ্গে বে হয়েছে।' ঐ কথা শুনতে হবে বলে কোনখানে যেতুম না। একবার সেখানে আমার কি অসুখই করেছিল—কিছুতে সারে না। শেষে মা সিংহবাহিনীর তুয়ারে হত্যে দিয়ে তবে সারে। বড় জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটি কৌটায় করে রেখেছি। নিজে খাই এবং রাধুকে রোজ সেই মাটি একটু করে খেতে দিই।"

মায়ের বাড়ীর সামনের মাঠে নানা দেশের কতকগুলো স্ত্রী-পুরুষ বাস করে। নানা প্রকার কাজ করে তারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। তার মধ্যে এক জনের উপপত্নী ছিল, উভয়ে একত্রেই বাস করত। ঐ উপপত্নীর কঠিন পীড়া হয়েছিল। মা ঐকথার উল্লেখ করে বললেন, "কি

সেবাটাই করেছে মা, এমন দেখি নি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান।” ইহা বলে ঐরূপে তার সেবার কতই সুখ্যাতি করতে লাগলেন। উপপত্নীর সেবা! আমরা উহা দেখলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতুম্, সন্দেহ নাই। মন্দের মধ্য হতেও ভালটুকু যে নিতে হয়, তা কি আর আমরা জানি!

সামনের মাঠের ঘর হতে একটি দরিদ্রা হিন্দুস্থানী নারী তার রুগ্ন শিশুটিকে কোলে করে মায়ের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে। তার প্রতি মায়ের কি দয়া! আশীর্ব্বাদ করলেন, “ভাল হবে।” তারপর দুটো বড় বেদানা ও কতকগুলো আঙ্গুর ঠাকুরকে দেখিয়ে এনে তাকে দিতে বললেন। আমি মায়ের হাতে ঐগুলো এনে দিলে মা সেই নিঃস্ব রমণীটিকে দিয়ে বললেন, “তোমার রোগা ছেলেকে খেতে দিও।” আহা! সে কতই খুশি হয়ে যে গেল! বারবার মাকে প্রণাম করতে লাগল।

১৩১৮—পটলডাঙ্গার বাসা হতে বৈকালে গিয়েছি। মায়ের ঘরে গিয়ে বসতেই গোলাপ-মা এসে আমাকে বললেন, “একটি সন্ন্যাসিনী গুরুর দেনাশোধ করতে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কাশী হতে এসেছেন। তোমাকে কিছু দিতে হবে।” আমি সানন্দে স্বীকৃত হলুম। মা হেসে বললেন, “আমাকেও ধরেছিল। আমি কি

কারো কাছে টাকা চাইতে পারি মা? বললুম, 'থাকো, হয়ে যাবে।' গোলাপ-মা বললেন, "হ্যাঁ, মা আমার শেষে হিল্লে (উপায়) করে দিয়েছেন।" মা আস্তে চুপি চুপি আমাকে বলছেন, "গোলাপ তিনখানা গিনি দিয়েছে।"

খানিক পরে সেই সন্ন্যাসিনী এলেন। তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে ভক্তেরা তাঁকে যাঁর যা সাধ্য কিছু কিছু দিয়েছেন। শুনলুম, সন্ন্যাসিনী হবার পূর্ব্বে তাঁর বৃহৎ সংসার ও সাত ছেলে ছিল, তারাই এখন কৃতী হয়ে সকল বিষয়ের ভার নিতে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

সন্ন্যাসিনী—গুরুনিন্দা করতে নেই, বলে।

তারপর তিনি প্রণাম করে বলছেন, "বড় মোকদ্দমা-প্রিয় ছিলেন···এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর পারেন না। ওদিকে পাওনাদার ডিক্রী পেয়ে ধরতে চায়। কি করি, তাই তাঁর জন্যে ভিক্ষায় বেরিয়েছি।"

এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা একটি শ্লোক বললেন, শ্লোকটি মনে পড়ছে না। তবে ভাবটি এই—উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।

মা আরও বললেন, "তবে গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি।

ঠাকুরের শিষ্য-ভক্তদের কি ভক্তি দেখ দেখি! এই গুরুভক্তির জন্যে ওরা গুরুবংশের সকলকে ভক্তি তো করেই, গুরুর দেশের বিড়ালটাকে পর্য্যন্ত মান্য করে।"

সন্ন্যাসিনী রাত তিনটা হতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত জপধ্যান করেন। সেই জন্য একখানি ধোয়া কাপড় চাইলেন; মা ভূদেবের একখানি কাপড় দিতে বললেন। সন্ন্যাসিনী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রাতে থাকবে? থাক ত তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে পারি।" মনে মনে ভাবলুম, 'আমাদের মার কাছে আবার আপনি কি শিখাবেন!' কিন্তু প্রকাশ্যে বললুম, "না, আমার থাকা হবে না।"

আমার গাড়ী এসেছে। সন্ধ্যারতি হতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

২৮শে মাঘ, ১৩১৮

আজ মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা আক্ষেপ করে বললেন, "আহা, গিরিশ বাবু মারা গেছেন—আজ চারদিন, চতুর্থীর কাজ, আমায় নিতে এসেছিল। সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! কি ভক্তি-বিশ্বাসই ছিল! গিরিশ ঘোষের সে কথা শুনেছ? ঠাকুরকে পুত্রভাবে

চেয়েছিল। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'হাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।' তা কে জানে মা, ঠাকুরের শরীর যাবার কিছুকাল পরে গিরিশের এমন একটি ছেলে হল, চার বছর হয়েও কারো সঙ্গে কথা বলে নি। হাবভাবে সব জানাত। ওরা ত তাকে ঠাকুরের মত সেবা করত। তার কাপড় জামা, খাবার জন্য রেকাব, বাটি, গেলাস, সমস্ত জিনিস-পত্র নূতন করে দিলে—সে সব আর কাউকে ব্যবহার করতে দিত না। গিরিশ বলত, 'ঠাকুরই এসেছেন।' তা ভক্তের আবদার, কে জানে মা। একদিন আমাকে দেখবার জন্যে এমন অস্থির হল যে, আমি উপরে যেখানে ছিলুম—সকলকে টেনে টেনে সেই দিকে 'উ-উ' করে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে কেউ বোঝে নি। শেষে বুঝতে পেরে আমার কাছে নিয়ে গেল, তখন ঐটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করলে। তারপর নীচে নেমে গিরিশকে ধরে টানাটানি—আমার কাছে নিয়ে আসবে বলে। সে ত হাউ-হাউ করে কাঁদে আর বলে, 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী।' ছেলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে করে কাঁপতে কাঁপতে, দুচক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে বললে, 'মা, এ হতেই তোমার

শ্রীচরণদর্শন হল আমার।' * ছেলেটি কিন্তু মা, চার বছরেই মারা গেল।

"এর আগে একদিন গিরিশ ও তার পরিবার তাদের বাড়ীর ছাদে উঠেছিল। আমি তখন বলরাম বাবুর বাড়ীতে, বিকেল বেলা ছাদে গেছি। গিরিশের ছাদ হতে তাকালে যে দেখা যায়, সেটা আমি লক্ষ্য করি নি। পরে তার পরিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরিশকে বলেছিল, 'ঐ দেখ, মা ও বাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছেন।' গিরিশ ঐ কথা শুনে অমনি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'না না, আমার পাপ-নেত্র, এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।' ইহা বলে নীচে নেমে গিছিল।"

১লা আষাঢ়, ১৩১৯

বেলা প্রায় চারটা, শ্রীশ্রীমা অনেক স্ত্রী-ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। আমার পরিচিতার মধ্যে তাঁদের ভিতরে আছেন মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী, ডাক্তার দুর্গাপদ বাবুর স্ত্রী, গৌরীমা ও তাঁর পালিতা কন্যা যাঁকে আমি দুর্গাদিদি বলে ডাকি এবং বরেন বাবুর পিসী। আর যাঁরা আছেন, তাঁদের চিনি না। মা হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা

* মা তখন বরানগর কুটীঘাটা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটে বাটীতে ছিলেন।

কচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এই যে এস মা, বস।" আমি গৌরীমাকে দিয়ে নীচে আফিস ঘর হতে 'নিবেদিতা' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুখানি আনালুম। আমার ইচ্ছা, মা 'নিবেদিতা' বইখানির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বলছেন, "ওখানি কি বই গা?" আমি বললুম—'নিবেদিতা'। মা বললেন, "পড় ত মা, একটু শুনি। সেদিন আমাকেও একখানি ঐ বই দিয়ে গিয়েছে, এখনও শোনা হয় নি।" যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লজ্জা করতে লাগল, তথাপি নিবেদিতার সম্বন্ধে সরলাবালা কেমন সুন্দর লিখেছেন, তা মাকে শোনাবার আগ্রহে ও মায়ের আদেশে পড়তে আরম্ভ করলুম। শ্রীশ্রীমা ও সমবেত স্ত্রী-ভক্তেরা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম, মায়ের চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কি করবে ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধূলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও

সঙ্কুচিত হচ্চে।” কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার কথা ভেবে স্থির হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন, “ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।” অপর একজন বললেন, “তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বলতেন। সরস্বতী-পূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।” পুস্তকপড়া শেষ হল। শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, “যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?”

এইবার মা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিতে বসলেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন সময়ে স্বহস্তে অনেকগুলি ফুলের মালা গেঁথে বৈকালে পরিয়ে দিবেন বলে ঠাকুরের সামনে রেখেছিলেন। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী ঐগুলির নিকটেই ভোগের জন্য রসগোল্লা এনে রেখে গেছেন। তার রস গড়িয়ে ফুলের মালাতে লেগে ডেয়ো পিঁপ্ড়ে ধরেছে। মা হাসতে হাসতে বলছেন, “এইবার ঠাকুরকে পিঁপ্ড়েয় কামড়াবে গো! ও রাসবেহারী, এ কি করেছ?” ইহা বলে সযত্নে পিঁপ্ড়ে ছাড়িয়ে ঠাকুরকে পরিয়ে দিলেন। মা ঐরূপে সকলের সামনে নিজের

স্বামীকে মালা পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন দেখে রাধুর মা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিতে গৌরীমাকে বললেন এবং সকলে প্রসাদ পেলেন।

একজন স্ত্রী-ভক্ত বললেন, "আমার পাঁচটি মেয়ে মা, বে দিতে পারি নি, বড়ই ভাবনায় আছি।"

শ্রীশ্রীমা—বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"

ঐ কথা শুনে আর একজন স্ত্রী-ভক্ত বললেন, "মায়ের উপর যদি তোমার ভক্তি-বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ কর, ভাল হবে। মা যখন বলছেন তখন আর ভাবনা কি?" বলা বাহুল্য মেয়ের মায়ের এ সব কথা মনে ধরল না।

অপর একজন বললেন, "এখন ছেলে পাওয়া কঠিন, অনেক ছেলে আবার বে করতেই চায় না।"

শ্রীশ্রীমা—ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে, সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝতে পারছে। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।

একে একে অনেকেই শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা হয়েছে, পূজনীয়া যোগীন-মা এসে

শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি করতে বসলেন। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে জপধ্যান করছিলেন। পরে তিনি উঠে আসতে অপর স্ত্রী-ভক্তেরা সকলে প্রণাম করে বিদায়গ্রহণ করলেন।

সকলে চলে যেতে মাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, স্ত্রীলোকদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পূজো করা চলে কি?"

শ্রীশ্রীমা বললেন, "হাঁ মা, চলে—যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে। এ কথা আমিও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যদি পূজো না করার জন্যে তোমার মনে খুব কষ্ট হয় তা হলে করবে, তাতে দোষ নেই। নতুবা করো না।' তা তুমি পূজো করো, কিন্তু মনে কোন দ্বিধা এলে করো না।" সকলকেই যে মা ঐরূপ করতে বলতেন, তা নয়। কারণ, দিন কয়েক পরে ঠিক এই একই অবস্থার আর একটি স্ত্রী-ভক্তকে বলেছিলেন, "এই অবস্থায় কি ঠাকুর-দেবতার কাজ করতে হয়? তা করো না।" ঐরূপে মা লোকের মানসিক অবস্থা দেখে কাকে কখন কি বলতেন, তা অনেক সময় বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

অনেক রাত হয়েছে। এখনও আমাকে নিতে আসে নি। গোলাপ-মা ডেকে জিজ্ঞাসা করাতে নীচে হতে

কে বললেন, "আমরা বলে দিয়েছি—গৌরীমার সঙ্গে চলে গেছেন বোধ হয়।" শুনে আমি মাকে বলছি, "না আসে, আজ থাকাই যাবে।"

মা বললেন, "সে তো কোন ভাবনা নেই, কিন্তু আজ পয়লা—অগস্ত্যযাত্রা, আজ বাড়ী হতে যাত্রা করে এসে কোথাও থাকতে নেই।"

মনে ভাবলুম—এমন স্থানে যদি অগস্ত্যযাত্রা হয়, সে তো ভালই।

রাত্রে ঠাকুরের ভোগের পর সকলে প্রসাদ খেতে বসলেন। মা আমাকে বৈকালে অনেক প্রসাদ দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি পুনরায় এখন প্রসাদ পেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গোলাপ-মা বললেন, "কেন গো, আমাদের বাড়ী এসে উপোস করে থাকবে কেন?"

মা বললেন, "না-না, দুখানি খাবে বৈকি?"—বলে নিজে একখানি রেকাবিতে চারখানা লুচি, তরকারি, মিষ্টি প্রভৃতি এনে দিলেন। রাত যখন প্রায় এগারটা এই সময় শ্রীমান্ বিনোদ আমাকে নিতে এল, সে গৌরীমার আশ্রমে গিয়ে আমাকে না পেয়ে পুনরায় এসেছে। নীচে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেকেই শয়ন করেছেন। মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে বললেন, "থাকা হল না গো, তা আর একদিন এসে থেকো।"

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে নেমে আসছি, শুনছি—পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলছেন, "সাবধানে সিঁড়িতে নামিয়ে নিয়ো বিনোদ, রাত হয়েছে।" তিনি নিচের বৈঠকখানা ঘরে শুয়েছেন। বাসায় ফিরতে রাত বারটা হয়েছিল।

আর একদিন গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে বিশ্রাম করছেন। আদেশ মত তাঁর কাছে শুয়ে বাতাস করছি, এমন সময়ে তিনি সহসা আপন মনেই বলছেন, "তাই ত মা, তোমরা সব এসেছ, তিনি (ঠাকুর) এখন কোথায়?" শুনে বললুম, "এ জন্মে ত তাঁর দর্শন পেলুমই না। কোন জন্মে পাব কি-না তা তিনিই জানেন। আপনার যে দর্শন পেয়ে গেছি—এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।" শ্রীশ্রীমা বললেন, "তা বটে।" ভাবতে লাগলুম, কি ভাগ্য যে এ কথাটি স্বীকার করলেন! সব সময়েই ত দেখি নিজের কথা চেপে যান।

মায়ের কাছে কত লোকের কত রকমের গোপনীয় কথা যে থাকতে পারে—হাবা আমি তা তখন বুঝতে পারিতুম না। জানবই বা কেমন করে—মার কাছে তখন অল্পদিন মাত্র যাচ্ছি বই ত নয়। সেজন্য মার বাড়ীতে পৌঁছে তাঁর ঘরে তাঁকে দেখতে না পেলে আসবার

অপেক্ষা না করে খুঁজে খুঁজে যেখানে তিনি আছেন সেই-খানেই গিয়ে দেখা করতুম। একদিন বিকাল বেলা বেশ সুশ্রী দুটি বৌ মাকে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে গোপনে কি বলছেন। এমন সময়ে আমি মাকে দেখতে একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির। শুনতে পেলুম মা তাঁদের বলছেন, "ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের ব্যথা কেঁদে বলবে—দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দিবেন।" বুঝতে বাকি রইল না, বৌ দুটি মার কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমাকে দেখে তাঁরা লজ্জিতা হলেন, আমিও ততোধিক। আমার কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গেল। মনে মনে স্থির করলুম, আর কখনও সাড়া না দিয়ে মাকে এমন করে দেখতে যাব না। কয়েক মাস পরে মার বাড়ীতে বৌ দুটির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এবং বুঝেছিলুম তাঁরা উভয়েই সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন।

গৌরীমা এসেছেন। তাঁকে একটু ঠাকুরের কথা বলতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "আমি ঠাকুরের কাছে অনেক আগে গিয়েছিলুম। তারপরে আর সকলে আসতে লাগলেন। এই নরেন, কালী এদের ছোট দেখেছি।" বেলা বেশী নেই দেখে আর অধিক কথা

হলো না। মাকে প্রণাম করে গৌরীমা বিদায় নিলেন।

আমাকেও যেতে হবে। মাকে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বারান্দায় ডেকে এনে প্রসাদ দিলেন; বলতে লাগলেন, "তবে এস মা। আমার সব ছেলেমেয়েগুলো আসে, আবার একে একে চলে যায়। একদিন সকালে সাতটায় এস। এখানে প্রসাদ পাবে।"

রথযাত্রা, ৩২শে আষাঢ়, ১৩১৯

আজ প্রাতে সাতটায় গৌরীমার আশ্রমে গিয়েছিলুম, তিনি প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, ওখান হতে সকাল সকাল শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাব। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠল না। ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তসেবা সাঙ্গ হতে প্রায় দুটো বেজে গেল। চারটার সময় গৌরীমাকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলুম, তখন মা বৈকালের ভোগ দিতে বসেছিলেন। ভোগ দিয়ে উঠলে প্রথমে গৌরীমা, পরে আমি মাকে প্রণাম করলুম। গৌরীমা তাঁকে একটু নিভৃতে নিয়ে গেলেন এবং কি কথাবার্ত্তার পরে আমাকে ডাকলেন। মার জন্য একখানি গরদ নিয়েছিলুম। উহা পদপ্রান্তে রেখে প্রণাম করে বললুম, "মা, এখনি পরবেন।"

মা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, পরবো বই কি।" গৌরীমা আমাকে স্নেহভরে প্রশংসা করতে লাগলেন। মাও তাতে একটু যোগ দিলেন। ঠাকুরঘরে মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী ও কন্যা এবং অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তও অনেকে আছেন। সকলকে চিনি না। মাষ্টার মশায়ের মেয়ে ও স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করার পর পুরুষ-ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসছেন শুনে আমরা সকলে বারান্দায় গেলুম। একটি ভক্ত কতকগুলো প্রস্ফুটিত গোলাপ ও জবা, এক ছড়া সুন্দর জুঁই ফুলের গড়ে' এবং ফল ও মিষ্টি এনেছিলেন। মায়ের পদপ্রান্তে ঐ সব রেখে চরণপূজা করতে লাগলেন। সে এক সুন্দর দৃশ্য! মা সহাস্যমুখে স্থির হয়ে বসে—গলায় ভক্তপ্রদত্ত মালা, শ্রীচরণে জবা ও গোলাপ। পূজা-শেষে ভক্তটি ফল মিষ্টি প্রত্যেক জিনিস হতে কিছু কিছু নিয়ে মাকে প্রসাদ করে দিতে প্রার্থনা করলেন। গৌরীমা তাই শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "শক্ত ভক্তের পাল্লায় পড়েছ মা, এখন খাও।" মাও তাতে হাসতে হাসতে "অত না, অত না—অত খেতে পারব না" বলে একটু একটু খেয়ে ভক্তের হাতে দিতে লাগলেন। ভক্তটি প্রত্যেক দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত

হয়ে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। মা তখন নিজের গলার ফুলের মালাটি গৌরীমার গলায় পরিয়ে দিলেন। পদে নিবেদিত ফুলগুলি ভক্তেরাই নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভূদেব রথ তৈরী করেছে। ঠাকুর রথে উঠবেন, সেই আয়োজন হচ্ছিল। গৌরীমার আশ্রমে বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়ে পুনরায় মায়ের কাছে ফিরে গেলুম।

কথায় কথায় গৌরীমার কথা উঠল। মা বললেন, "আশ্রমের মেয়েদের ও বড় সেবা করে—অসুখ-বিসুখ হলে নিজের হাতে তাদের গু-মূত পরিষ্কার করে। সংসারে ওর ও-সব ত আর বড় একটা করা হয় নি, ঠাকুর যে সবই করিয়ে নেবেন—এই শেষ জন্ম কি-না।"

এইবার পাশের ঘরে ঠাকুর রথে উঠলেন। মা তক্তাপোশে বসে অনিমেষ-নয়নে তাঁকে দেখতে দেখতে কত যে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন! পরে ভূদেব ও ভক্তেরা মিলে রথশুদ্ধ ঠাকুরকে ধরে তুলে নীচে নিয়ে গেলেন এবং রাস্তায়, গঙ্গার ধারে রথ টেনে সন্ধ্যার পর আবার ঘরে আনলেন। এইবার স্ত্রী-ভক্তেরা উপরের ঘরের ভিতর রথ টানলেন। তারপর মা, রাধু, নলিনী-দিদি ও আমি টানলুম। যে কেহ আসতে লাগল

তাকেই মা আনন্দ করে রথের কথা বলতে লাগলেন। ভক্ত-মহিলারা প্রসাদ নিয়ে একে একে চ'লে গেলেন। পরে রাত্রির ভোগ-আরতি হতে মা নিজেই একখানি থালায় করে প্রসাদ এনে আমাকে দিলেন। সেদিন বাসায় ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে এগারটা হয়ে গিয়েছিল।

যখন সামনের রাস্তায় রথ টানা হচ্ছিল, মা বলে-ছিলেন, "সকলে ত জগন্নাথ যেতে পারে না। যারা এখানে (ঠাকুরকে রথে) দর্শন করলে, তাদেরও হবে।"

রাধাষ্টমী, ২রা আশ্বিন—১৩১৯

গৌরীমার আশ্রমের স্কুলের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় মায়ের নিকট আর ইচ্ছানুসারে আজকাল যাওয়া হয়ে ওঠে না। রাধাষ্টমীর দিন অবসর পেয়ে গিয়ে দেখি, মা গঙ্গাস্নানে যাবেন বলে পাশের ঘরে তেল মাখছেন। লোকে বলে, তেল মাখলে প্রণাম করতে নেই এবং মানব-দেহ ধারণ করলে জগজ্জননীও মানব-রীতির বশীভূতা হয়ে চলেন, তাই প্রণাম করলুম না। আমাকে দেখেই মা বললেন, "এস মা, এস, সকালে এসেছ—বেশ করেছ। আজ রাধাষ্টমী, দিনও ভাল, বস, আমি স্নান করে আসি।" আমি তাঁর সঙ্গে গঙ্গায় যাব বলায় মা বললেন,

"তবে এস।" কিন্তু অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গোলাপ-মা আমাকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। মাও তখন গোলাপ-মার মতে মত দিয়ে বললেন, "তবে থাক মা, আমি এখনি আস্‌ছি।" কাজেই রইলুম। ঐরূপ প্রায়ই দেখতে পেতুম—সরলা বধূটির মত মা কারও কথার উপর জোর করে কিছু বলতেন না। যা হোক, রাস্তায় মা বেরুতেই জল ধরে গেল। মা তাই বাড়ী ফিরে এসেই আমাকে বললেন, "বেরুতেই জল ধরে গেল দেখে আমি ভাবলুম, আহা তুমি আসতে চেয়েছিলে, এলে বেশ হত, গঙ্গাদর্শন করে যেতে।" সত্যি কথা বলতে কি, আমি গঙ্গাদর্শনের জন্য যত না হোক, মার সঙ্গে যাবার আকাঙ্ক্ষাতেই যেতে চেয়েছিলুম। কারণ, সংসারে নানা বাধাবিঘ্নের জন্য মার কাছে ত আসাই হয় না, সেজন্য ভাগ্যক্রমে যে দিন আসা ঘটে, সে দিন আর ইচ্ছা হয় না যে এক মুহূর্ত্তও মাকে চোখের আড়াল করি। গোলাপ-মা মায়ের কথা শুনে বললেন, "নাই বা গেছে, তোমার পা ছুঁলেই সব হবে।" আমিও তাই বলতেই মা বললেন, "আহা, সেকি কথা! গঙ্গা!" ঐরূপে ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় মা কখন নিজের মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করতেন না—অপর সকলের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানুষ এইরূপই বলতেন এবং দেখাতেন। তবে

এও দেখেছি, অন্য কেহ কাছে না থাকলে কখন কখন কার কারও প্রতি কৃপায় তাঁর অসীম মহিমান্বিত জগন্মাতার ভাব প্রকাশ পেত। ঘরে এসেই তক্তাপোশ-খানির উপর বসে আমাকে বললেন, "বেশ, গঙ্গাস্নান করেও এসেছি।" বুঝলুম আমি যে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করব মনে করে এসেছি তা টের পেয়েছেন। মনে মনে বললুম—নিত্যশুদ্ধা তুমি মা, তোমার আবার গঙ্গাস্নান! তাড়াতাড়ি ফুল-চন্দনাদি নিয়ে পদতলে বসতেই বললেন, "তুলসীপাতা থাকে যদি ত পায়ে দিও না।" পূজাশেষ হলে প্রণাম করে উঠলুম। মা এইবার জল খেতে বসলেন। সেই অপূর্ব্ব স্নেহে কাছে নিয়ে বসা এবং প্রত্যেক জিনিসটির অর্দ্ধেক খেয়ে প্রসাদ দেওয়া! আমিও মহানন্দে প্রসাদ পেলুম। শালপাতাখানিতে করে প্রসাদ খাবার সময় সাধু নাগ মহাশয়ের কথা মনে হল। শ্রীশ্রীমাকে বললুম, "মা, শালপাতায় প্রসাদ পেলেই নাগ মহাশয়ের কথা মনে পড়ে।"

মা বললেন, "আহা, তার কি ভক্তিই ছিল! এই ত দেখ শুক্‌নো কট্‌কটে শালপাতা! একি কেউ খেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে প্রসাদ ঠেকেছে বলে পাতাখানা পর্য্যন্ত খেয়ে ফেল্‌লে! আহা, কি প্রেম-চক্ষুই ছিল তার! রক্তাভ চোখ, সর্ব্বদাই জল পড়ছে!

কঠোর তপস্যায় শরীরখানি শীর্ণ। আহা, আমার কাছে যখন আসত ভাবের আবেগে সিঁড়ি দিয়ে আর উঠ্‌তে পারত না, এমনি (নিজে দেখিয়ে) থরথর করে কাঁপত—এখানে পা দিতে ওখানে পড়ত। তেমন ভক্তি আর কারও দেখলুম না।"

আমি বললুম, "বইএ পড়েছি, তিনি যখন ডাক্তারী ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে দিনরাত ঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় থাকতেন, তখন তাঁর পিতা একদিন বলেছিলেন, 'এখন আর কি কর্‌বি, নেংটা হয়ে ফির্‌বি আর ব্যাঙ্‌ ধরে খাবি।' উঠানে একটা মরা ব্যাঙ্‌ পড়ে আছে দেখে নাগ মহাশয় কাপড়খানি ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সেই ব্যাঙ্‌টা ধরে খেয়ে পিতাকে বলেছিলেন, 'আপনার দুই আদেশই পালন করলুম, আপনি আমার খাওয়া-পরার চিন্তা ছেড়ে ইষ্টনাম করুন।' "

মা—আহা, কি গুরুভক্তি! কি শুচি-অশুচিতে সমজ্ঞান!

আমি আবার বললুম, "অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় কলিকাতা ছেড়ে নাগ মহাশয় বাড়ী গিয়েছিলেন, তাতে তাঁর পিতা ভৎর্সনা করে বলেছিলেন, 'গঙ্গাস্নান না করে গঙ্গার দেশ থেকে বাড়ী এলি?' কিন্তু যোগের সময় সকলে দেখে, উঠান ভেদ করে জল উঠে সারা উঠান

একেবারে ভেসে যাচ্ছে! আর নাগ মহাশয়—'এস মা গঙ্গে, এস মা গঙ্গে' বলে অঞ্জলিপূর্ণ করে সেই জল মাথায় দিচ্ছেন। তাই দেখে পাড়ার সকলে সেই জলে স্নান করতে লাগল।"

মা—হাঁ, তার ভক্তির জোরে অমন সব অদ্ভুতও সম্ভবে। আমি একখানা কাপড় দিয়েছিলুম, তা মাথায় জড়িয়ে রাখত। তার স্ত্রীও খুব ভাল আর ভক্তিমতী। এই সেবার —আমের সময় এখানে এসেছিল। এখনো বেঁচে আছে।

এই সময় অন্য কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত আসায় কথাটা চাপা পড়ে গেল। মা উঠে তাঁদের প্রণাম নিয়ে আমাকে পান সাজতে যেতে বললেন। খানিক পরে আমি দুটো পান এনে মাকে দিলুম। মা পান দুটি হাতে নিয়ে একটি খেয়ে একটি আমাকে খেতে দিলেন। আমি আবার বাকী পানগুলি সাজতে চলে এলুম। মাও অল্পক্ষণ পরে দুটি স্ত্রী-ভক্তের সহিত সেই ঘরে এসে বসলেন। স্ত্রী-ভক্ত দুটিও সাহায্য করায় খুব শীঘ্রই পান-সাজা হয়ে গেল। মা ঠাকুরের পানগুলি আলাদা করে আগে তুলে নিলেন এবং "আমার মা লক্ষ্মীরা কত শীগ্‌গির সেজে ফেল্‌লে" বলে আনন্দপ্রকাশ করতে লাগলেন।

এইবার মা তেতলায় গোলাপ-মার ঘরে গেলেন। খানিক পরে আমি সেখানে গিয়ে দেখি, মা ঐ ঘরের

দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে আছেন—কেমন করে ভিতরে যাই। আমাকে দেখে মা বলছেন, "এস, এস, তাতে দোষ নাই।" মার সর্ব্বত্র এইরূপ ভাব, পরে মা মাথা তুললেন। আমি ঘরে গিয়ে কাছে বসে তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম। মা শুয়ে শুয়ে গৌরীমার স্কুলের নানা কথা, আর গাড়ীভাড়া এ সব কথা পাড়লেন। আমি যথাযথ উত্তর দিতে লাগলুম। এই সময়ে সেই স্ত্রী-ভক্ত ছুটি সেখানে এলেন। তাঁদের একজন মায়ের চুল শুকিয়ে দিতে দিতে ছু-একটি পাকা চুল বেছে আঁচলে বেঁধে রাখতে লাগলেন ; বললেন, কবচ করবেন। মা লজ্জিতা হয়ে বললেন, "ও কেন, ও কেন? কত মুড়োমুড়ো কাঁচা চুল যে ফেলে দিচ্ছি।" মা এইবার উঠে ছাদে একটু রোদে গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলুম এবং একপাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করতে লাগলুম। এমন সময়ে ঘর হতে গোলাপ মা বলে উঠলেন, "মা ত সকলকে নিয়ে ছাদে গেলেন, এখন কে খাবে, কে না খাবে, তা আমি কি করে জানি?" ঐ কথা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গিয়ে তাঁকে বললুম, "বিধবাটি কেবল খাবেন না।" রৌদ্রে অনেকগুলি কাপড় ছিল, মা আমাকে সেগুলি তুলে ঘরে রাখতে বললেন। আমি তুলছি এমন সময়ে মা নীচে ঠাকুরের ভোগ দিতে

নামলেন। আমরাও সকলে নীচে ঠাকুরঘরে এলুম; ভোগ দেওয়া হলে মা আমাকে মেয়েদের খাবার-জায়গা করতে বললেন। পরে সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মা দুই-এক গ্রাস খাবার পরে আমাদের সকলকে প্রসাদ দিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আরও দুইটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছিলেন; তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধা সধবা ঠাকুরের সময়ের এবং অপরটি তাঁর পুত্রবধূ। বৃদ্ধাটি খেতে খেতে বললেন, "আহা, ঠাকুর আমাদের যে-সব কথা বলে গেছেন, তা কি আমরা পালতে পেরেছি, তা হ'লে এত ভোগ ভুগবে কে, মা? সংসার সংসার করেই মরছি—ওকাজ হল না, সেকাজ হল না—এই কেবল করছি।" মা তাঁর ঐ কথায় বললেন, "কাজ করা চাই বই কি, কর্ম্ম করতে করতে কর্ম্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।"

আহারান্তে মা এখন একটু বিশ্রাম করবেন—খাটের উপর শয়ন করলেন। সকলেই এখন তাঁর একটু সেবা করতে ব্যগ্র। মা কিন্তু সকলকেই বিশ্রাম করতে বললেন; খানিক পরে বাড়ীতে কাজ আছে বলে অপর স্ত্রীলোকেরা সব চলে গেলেন। আমি এবং ঠাকুরের সময়কার একটি বিধবা স্ত্রীলোক রইলুম। আমি এখন মার সেবার ভার একাই পেলুম। বিধবাটি মায়ের কাছে

বসে তাঁর সংসারের দুঃখের অনেক কথা বলতে লাগলেন, "মা, আপনার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা পাই, কিন্তু ওদের কাছে ক্ষমা নাই" ইত্যাদি। আমি কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন?"

"ও মা, দেখছি বই কি! তিনি যে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মা তখন বৌটির মতন থাকতেন।"

আমি বললুম, "ঠাকুরের দুটো কথা বলুন না—শুনি।" তিনি বলিলেন, "আমি না মা, মাকে বলতে বল।" কিন্তু মা তখন একটু চোখ বুঁজে আছেন দেখে আমি ওকথা বলতে পারলুম না। খানিক পরে মা নিজেই বলছেন, "যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই সে দিন * একটি ছেলে মারা গেল। আহা, সে কত ভাল ছিল! ঠাকুর তাদের বাড়ী যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত ২০০৲ টাকা ট্রামে তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ী এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে—'হায় ঠাকুর, কি করলে!' তার অবস্থাও তেমন ছিল না যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে কাঁদতে দেখে ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন, 'কাঁদছিস্ কেন? ঐ গঙ্গার ধারে ইঁট চাপা

---

* ৩১শে ভাদ্র ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথাই বলিতেছেন।

আছে ছ্যাখ।’ সে তাড়াতাড়ি উঠে ইটখানা তুলে দেখে —সত্যিই এক তাড়া নোট! শরতের কাছে এসে সব বললে। শরৎ শুনে বললে, ‘তোরা ত এখনো দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাই নে।’ ওরা পাবে কি? ওরা ত দেখে শুনে এখন গ্যাঁট্ হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখে নি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশী।

“ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের বড় খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে ‘ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় খিদে পেয়েছে’ বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরাম বাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুর ত আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, ‘ওরে আয় না রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। খিদে পেয়েছে বল্‌লি যে।’ রাখাল তখন রাগ করে বলতে লাগল, ‘আপনি অমন করে সকলের সামনে খিদে পেয়েছে বললেন কেন?’ তিনি বললেন, ‘তাতে কিরে, খিদে পেয়েছে, খাবি তা বলতে দোষ কি?’ তাঁর ঐ রকমই স্বভাব ছিল কি-না।”

এমন সময় ভূদেব স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে এল। মা তার জন্য বিছানা করে দিতে বললেন। বিছানা করে দিলুম। মাকে আজ একবার বলরাম বাবুর বাড়ী যেতে হবে রাম বাবুর মাকে দেখতে—কারণ তিনি রক্তা-মাশয়ে খুব পীড়িতা। তাই তাড়াতাড়ি উঠে বৈকালের কাজকর্ম্ম সেরে নিতে লাগলেন, বললেন, "একবার যেতেই হবে, মাকুর স্কুলের (নিবেদিতা স্কুলের) গাড়ী এলে দাঁড়াতে বোলো।" ঠাকুরকে বৈকালী ভোগ দিয়ে উঠে আমাকে কিছু প্রসাদ নেব কি-না জিজ্ঞাসা করায় বললুম, "এখন থাক্।" মা বললেন, "তবে পরে খেয়ো। নলিনী, খেতে দিস্।" মাকুর গাড়ী আসতেই বললেন, "আমি শীগ্‌গির ঘুরে আসছি, তুমি বসে থেক, আমি না এলে যেও না।" মা ও গোলাপ-মা বলরাম বাবুর বাড়ী গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলেন। এদিকে খবর এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে। আমি কিন্তু মার ফিরবার অপেক্ষায় ছিলুম। মা এসেই বললেন, "এই যে আছ মা, আমি এই তোমার জন্য তাড়াতাড়ি আসছি ; জল খেয়েছ ?"

"না, মা।"

"সে কি নলিনী, খেতে দিস্ নি ? বলে গেলুম।"

নলিনী (লজ্জিতভাবে)—মনে ছিল না, এই দিচ্চি।

মা—না, থাক্, এখন আর তোকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্চি। (আমার প্রতি) তুমি চেয়ে খাও নি কেন মা? এ যে নিজের বাড়ী।

আমি বললুম, "তেমন খিদে পেলে চেয়ে খেতুম বই কি, মা।"

মা তাড়াতাড়ি নিজেই কিছু প্রসাদী মিষ্টি এনে দিলেন। আমিও আনন্দের সহিত খেলুম। "পান দি" বলে সাজাপান আনতে গেলেন। নলিনী দিদি বললেন, "বোগনোতে আর পান সাজা নেই, দেবে কি?" কিন্তু পুনরায় খুঁজতে গিয়ে মা তাতেই দুটি সাজা পান পেয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় চাইতে "এস মা, আবার এস, দুর্গা, দুর্গা" বলে উঠে বললেন, "আমি সঙ্গে যাব কি? একলা নেমে যেতে পারবে? রাত হয়েছে।"

আমি বললুম, "খুব পারব মা, আপনাকে আসতে হবে না।" মা তবু "দুর্গা, দুর্গা" বলতে বলতে সহাস্য মুখে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, "আর দাঁড়াতে হবে না মা, আমি বেশ যেতে পারব।"

আর একদিন—সে দিন অক্ষয়তৃতীয়া, পূর্ব্বোক্ত

সধবা বৃদ্ধাটি ও তাঁর বধূ স্নান করে এসে পৈতে আর দু-একটি কি ফল মায়ের হাতে দিতে গেলে মা বললেন, "আমাকে কেন? ভূদেবকে দাও।" তার খানিক পরে কথায় কথায় আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "আজকের দিনে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি, তোমাদের মুক্তিলাভ হোক্। জন্ম-মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।"

শেষ সপ্তাহ, আশ্বিন, ১৩১৯

পূজার ছুটিতে একদিন সকালেই মার কাছে গেলুম। দেখলুম, মা খুব ব্যস্ত। আমাকে বসতে বলে রাঁচি হতে কে ভক্ত এসেছেন তাঁকে ডাকতে বললেন। ভক্তটি অনেক ফল, ফুল, কাপড় ও একছড়া কাপড়ের গোলাপের মালা—দেখতে ঠিক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত—নিয়ে উপরে এলেন। মালাটি মাকে গলায় পরতে অনুরোধ করায় মা উহা পরলেন। এমন সময়ে গোলাপ-মা এসে মালার লোহার তার মায়ের গলায় লাগবে বলে ভক্তটিকে বকলেন। ভক্তটিকে অপ্রতিভ হতে দেখে করুণাময়ী মা বললেন, "না, না, লাগছে না, কাপড়ের উপর পরেছি।" ভক্তটি প্রণাম করে নীচে গেলেন।

পরে মা ও আমি জলখাবার (প্রসাদ) খেতে

বসলুম। আমি কিছু ফল ও খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম মাকে দেবার জন্য। উহা তাঁর কাছে আনতেই মা বল্লেন, ঠাকুরকে নিবেদন করে নিয়ে এস।" নিয়ে আসতে তা থেকে একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে বল্লেন, "আহা, বেশ মিষ্টি ত।" একখানি কাপড় কয়েকদিন পূর্ব্বে দিয়েছিলুম। সেই কাপড়খানিই পরেছিলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ গো, তোমার কাপড় পরে পরে কালো করেছি।" অবাক হয়ে ভাবলুম—এই অযোগ্য সন্তানের ওপর তোমার এতই কৃপা ও স্নেহ! মা নিজের পাত হতে প্রসাদ তুলে তুলে আমাকে দিতে লাগলেন। আমি হাত পেতে নিচ্চি, এমন সময় হঠাৎ একবার তাঁর হাতে আমার হাত ঠেকে গেল। আমি বললুম, "মা, হাত ধুয়ে ফেলুন।" মা হাতে একটু জল দিয়ে বললেন, "এই হয়েছে।" এই সময়ে নলিনী দিদি এসে বসলেন, ইতঃপূর্ব্বে কি কারণে যেন্ তিনি রাগ করে-ছিলেন। মা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "মেয়ে মানুষের অত রাগ কি ভাল, সহ্য চাই। শৈশবে বাপ-মায়ের কোল, যৌবনে স্বামীর আশ্রয় ছাড়া মেয়েদের আর কেউ 'আব্রুতে' পারে না। মেয়েলোক বড় খারাপ জাত, ফস্ করে একটা যদি কেউ বলেই ফেল্লে

গো। মানুষের তো কথা—বললেই হল। তাই দুঃখকষ্ট সয়েও (স্বামী বা বাপ-মায়ের কাছে) থাকতে হয়।"

একটু পরে রাধু এসে হাঁটুর কাপড় তুলে বসেছে। আবার মা তাকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন, "ও কি গো, মেয়েলোকের হাঁটুর কাপড় উঠ্‌বে কেন?" ইহা বলে কি একটি শ্লোক বললেন, তার মানে হাঁটুর কাপড় উঠলেই মেয়েলোক উলঙ্গের সামিল।

চন্দ্রবাবুর ভগ্নী এসেছেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মার গোঁসাই (স্বামী) আছেন? এ সব বুঝি ছেলে, মেয়ে, বউ?"

আমি—কেন, ঠাকুরের কথা শোনেন নি? তাঁর শিক্ষাই ছিল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ।"

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমি মনে করেছি এরা সব ছেলে, বউ হবে।"

দুর্গাপূজা আসছে। মা তাই জামাইদের * কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখছিলেন এবং আমাকে পৃথক করে বেঁধে রাখতে বললেন। আর একখানি কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এখানা কুঁচিয়ে রাখত মা, গণেন পূজোর সময় পরে মঠে যাবে।"

---

* মার তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রী—তাঁদের স্বামীর জন্য।

মধ্যাহ্নের ভোগ ও প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল। আহারান্তে মা বিশ্রাম করছেন। আমি নিকটে বসে বাতাস করছিলুম। মা তাতে বললেন, "ঐখান হতে একটা বালিশ নিয়ে আমার এইখানে শোও, আর বাতাস লাগবে না।" মায়ের বালিশে কি করে শোব মনে করে রাধুর ঘর হতে একটা বালিশ নিয়ে আসতেই মা হেসে বললেন, "ওটা পাগলের (রাধুর মার) বালিশ গো, তুমি এই বালিশটাই আন না, তাতে দোষ নেই।" রাধুকে ডেকে বললেন, "রাধুও আয়, তোর দিদির পাশে শো।"

মার সঙ্গে চন্দ্রবাবুর ভগ্নীর সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। মা বললেন, "তা তুমি বল্লেই পারতে—হাঁ, এই ত তাঁর স্বামী ঘরে বসে আছেন, আর তোমরা সব ছেলেমেয়ে।"

আমি—সে ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কত ছেলে মেয়ে আছে, মা।

মা হাস্তে লাগলেন। কথায় কথায় আবার বল্লেন, "কত লোকে কত ভাবে আসে মা! কেউ হয় ত একটা শশা এনে ঠাকুরকে দিয়ে কত কামনা করে বলে—'ঠাকুর, তোমাকে এই দিলুম, তুমি এই করো।' এই এমনি কত কামনা!"

মা একটু পাশ ফিরে শুলেন। আমারও একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, জেগে দেখি মা পাখা নাড়ছেন। একটু পরেই মা উঠ্লেন। দেখলুম পাশের ঘরে কয়েকটি

স্ত্রীলোক বসে আছেন। তন্মধ্যে দু-জন গৈরিকধারিণী। তাঁরা মাকে প্রণাম করলেন। ঐ সঙ্গে একটি ছোট ছেলেও এসেছিল, সে প্রণাম করতেই মা প্রতি-নমস্কার করলেন। তাঁরা মিষ্টি এনেছিলেন, মা আমাকে তুলে রাখতে বল্‌লেন এবং হাতমুখ ধুতে গেলেন। পরিচয় জানলুম, তাঁরা কালীঘাটের শিবনারায়ণ পরমহংসের শিষ্যা, সম্প্রতি তাঁদের গুরুর ওখানে অহোরাত্রব্যাপী এক যজ্ঞ হচ্ছে—ইত্যাদি। একটু পরেই শ্রীশ্রীমা এসে বসলেন। গৈরিকধারিণীদের মধ্যে একজন মাকে বল্‌লেন, "আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

মা—বল।

গৈরিকধারিণী—মূর্ত্তিপূজায় কিছু সত্য আছে কি-না? আমাদের গুরু বলেন, 'মূর্ত্তিপূজা কিছু নয়, সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসনা কর।'

মা—তোমার গুরু যখন বলেছেন, তখন ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা না করাই ঠিক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হয়।

তিনি বল্‌লেন, "তা হবে না, আপনার মত বলতেই হবে।" মা নিজ মত বল্‌তে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু গৈরিকধারিণী একেবারে

নাছোড়। তখন মা বল্‌লেন, "তিনি (তোমার গুরু) যদি সর্ব্বজ্ঞ হতেন—এই দেখ তোমার জিদের ফল, কথায় কথা বেরুল—তা হলে ঐ কথা বল্‌তেন না। সেই আদিকাল হতে কত লোকে মূর্ত্তি-উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, সেটা কিছু নয়? আমাদের ঠাকুরের ওরূপ সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বল্‌ছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল গুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না।"

তাঁরা কিছুক্ষণ তর্ক করে শেষে নিরস্ত হলেন। তারপর তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার বাড়ী কোথায়?"

মা—কামারপুকুর, হুগলি জেলায়।

"এখানকার ঠিকানা কি বলুন, আমরা মাঝে মাঝে আসব।"

মা ঠিকানাটা লিখে দিতে বল্‌লেন। তাঁরা যে

মিষ্টি এনেছিলেন ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমা তা হতে ছেলেটিকে দিতে বলেছিলেন এবং আমি তখনই দিয়েছিলুম। একটু পরে তাঁরা বিদায় নিলেন। তাঁরা গেলে শ্রীশ্রীমা বললেন, "মেয়েলোকের আবার তর্ক! জ্ঞানী পুরুষরাই তর্ক করে তাঁকে বড় পেলে! ব্রহ্ম কি তর্কের বস্তু?" একটু পরেই আমার গাড়ী এল। মা বললেন, "এই গো পটলডাঙ্গার গাড়ী এসেছে বল্‌ছে, এখনি এল?" ঐ কথা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিলেন এবং কিছু প্রসাদ, প্রসাদী জলের গ্লাসটি এবং দুটি পান নিয়ে বারান্দায় আড়ালে গিয়ে ডাকলেন—"এস।" তাঁর স্নেহযত্নে আমার চোখে জল এল। ভাবতে লাগলুম—আবার কত দিনে মার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ, পূজার পরেই মা কাশী যাবেন। মা সস্নেহে বললেন, "আবার আস্‌বে।" এমন সময় বাহির হতে চন্দ্রবাবু এসে একটু বিরক্তির সহিত বল্‌লেন, "বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে গাড়োয়ান দিক্ করছে, আমি এই সকলকে বলে রাখলাম গাড়ী আসলে কেও যেন তিলার্দ্ধ দেরী না করেন।" শ্রীশ্রীমা তাই শুনে বল্‌লেন, "আহা, তার কি, এই ত যাচ্ছে—এস মা।" আমি অশ্রুসিক্ত চোখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে নেমে গেলুম। প্রাণের আবেগে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পিত্রালয়, জয়রামবাটী

সেদিন বাড়ীতে কারও সহিত ভাল করে কথা বলতে পারলুম না। সারারাতও ঐ ভাবে কেটে গেল।

১৮ই মাঘ, ১৩১৯

৩রা মাঘ মা কাশী হতে ফিরেছেন। সকালবেলা গিয়ে দেখি, মা পূজা করছেন এবং পূজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূজাশেষ হলে উঠে বললেন, "এই যে মা এসেছ, আমি ভাবছি দেখা হল না বুঝি, আবার শীগ্‌গির দেশে চলে যাব।" খাবার তৈরী করে নিয়ে গিয়েছি দেখে মা বললেন, "ঠাকুরের আজ মিষ্টি কম দেখে ভাবছিলুম। তা ঠাকুর তাঁর ভোগের জিনিস সব নিজেই যোগাড় করে নিলেন—তা আবার কেমন ঘরের তৈরী সব খাবার।" ঠাকুরকে ঐ সব নিবেদন করা হলে ভক্তদের জন্য এক একখানি শালপাতায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন। ভূদেব বললে, "এত দেব কাকে?"

মা হেসে বললেন, "দেখ ছেলের বুদ্ধি! নীচে যে সব ভক্তেরা আছে তাদের দিবি। দিয়ে আয়গে যা।"

একটু পরে রাঁচী হতে একটি ভক্ত এসে মাকে প্রণাম করে ফুলের মালা দিলেন এবং বললেন, "সুরেন আপনাকে এই টাকাটি দিয়েছে।" ইহা বলে টাকাটি মার পদতলে রাখলেন।

বেলা হয়েছে। রাধু সামনের মিশনরী স্কুলে যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত, এমন সময় গোলাপ-মা এসে মাকে বললেন, "বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কি?" এই বলে রাধুকে যেতে নিষেধ করলেন। রাধু কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, "কি আর বড় হয়েছে, যাক্ না। লেখাপড়া, শিল্প এ সব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এ সব জানলে নিজের এবং অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে, কি বল মা?" পরে রাধু স্কুলে গেল।

অন্নপূর্ণার মা একটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন দীক্ষার জন্য। তিনি বললেন, "মা, ও আমাকে খেয়ে ফেললে তোমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে। কি করি—নিয়ে এলুম।"

মা—আজ কি করে হবে? জল খেয়েছি।

অন্নপূর্ণার মা—ও ত খায় নি। তা মা তোমার খাওয়ায় ত আর দোষ নেই।

মা—একেবারে কি ঠিক হয়েই এসেছে?

অন্নপূর্ণার মা—হাঁ মা, একেবারে স্থির করেই এসেছে।"

মা সম্মত হলেন। দীক্ষার পরে শ্রীশ্রীমাকে মেয়েটির কথা বলতে লাগলেন—"ও কি মা তেমন

মেয়ে! ঠাকুরের বই পড়ে চুল কেটে পুরুষ সেজে তপস্যা করতে তীর্থে বেরিয়ে গিয়েছিল—একেবারে বৈদ্যনাথে গিয়ে হাজির! সেখানে এক বনের মধ্যে গিয়ে বসেছিল। ওর মায়ের গুরু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওকে দেখতে পেয়ে পরিচয় নিয়ে নিজের কাছে রেখে ওর বাপের কাছে সংবাদ পাঠাতে ওর বাপ গিয়ে নিয়ে এল।"

মা চুপ করে কথাগুলি শুনে বললেন, "আহা, কি অনুরাগ!" আর সকলে বলতে লাগলেন, "ও মা, সে কি গো! অমন রূপের ডালি মেয়ে (মেয়েটি খুবই সুশ্রী) কেমন করে রাস্তায় বেরিয়েছিল, হোক গে বাপু ভক্তি অনুরাগ!"

নলিনী—বাপরে, আমাদের দেশ হলে আর রক্ষে থাকত না।

অবশ্য এই সব কথা মেয়েটির ও অন্নপূর্ণার মার অসাক্ষাতেই বলা হচ্ছিল।

নলিনী ও আমার সঙ্গী একটি স্ত্রীলোক উভয়েই স্বামীর কাছে থাকেন না। কি কথায় যেন তাঁহাদের কথা এল। মা বললেন, "ঠাকুর বলতেন জরু, গরু, ধান—এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান," আর বললেন, "এ সব চারাগাছের সময় বেড়া না দিলে 'ছাগলে মুড়াবে মাথা'।"

দুপুরে আহারান্তে সকলে পাশের ঘরে শয়ন করলেন। নূতন মেয়েটিকেও মা একটু শুতে বললেন। সে বললে, "না মা, আমি দিনের বেলায় শুই না।" আমি তাকে বললুম, "মা বলচেন, কথা শুনতে হয়।" "তবে শুই" বলে সে একটু শুয়ে আবার তখনই উঠে বারান্দায় গেল। মা বললেন, "মেয়েটি একটু চঞ্চল, সেই জন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল।" মা মেয়েটির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির স্বামী কি করে? কেন মেয়েটিকে কাছে নিয়ে রাখে না?"

ঝি বললে, "তিনি অল্প মাইনে পান, আর ঘরে কেউ নেই, ওঁকে নিয়ে গিয়ে একলাও রাখতে পারেন না। তাই শনিবার শনিবার শ্বশুরবাড়ী আসেন।"

অন্নপূর্ণার মা—ও স্বামীকে বলে, 'তুমি আমার কিসের স্বামী, জগৎ-স্বামীই আমার স্বামী।'

মা কোন উত্তর দিলেন না।

ঠাকুর ঘরের উত্তরের বারান্দায় মেয়েরা সব গল্প করছিলেন। বড় গোল হচ্ছিল। মা বললেন, "বলে এস ত মা, আস্তে কথা বলতে; এক্ষুণি শরতের ঘুম ভেঙ্গে যাবে (তিনি নীচে বৈঠকখানা ঘরে শুয়েছিলেন)।" ঘরটি এখন নির্জ্জন দেখে মাকে সাধন-ভজন ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

মা বল্‌লেন, "ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে, আর যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যান-স্তুতি করবে, ধ্যান হয়ে গেলেই পূজো শেষ হল। এইখানেই (হৃদয়ে) আরম্ভ ও এইখানে (মস্তকে) শেষ করবে।" ইহা বলে দেখিয়ে দিলেন।

মা—মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে। উনিই সব।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমা ও দুর্গাদেবীর কথা উঠল। মা উভয়ের অনেক সুখ্যাতি করলেন। আর বললেন, "দেখ মা, চড় খেয়ে রামনাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সে-ই ধন্য। মেয়েটি যেন অনাঘ্রাত ফুল। গৌরদাসী মেয়েটিকে কেমন তৈরী করেছে! ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা করেছিল। গৌরদাসী ওকে লুকিয়ে হেথা সেথা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে! কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দেবে শুনছি।" গৌরীমার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন। তাতে জানলুম, তাঁর জীবনের উপর দিয়ে কম দুঃখ-ঝঞ্ঝা বয়ে যায় নি। কাশীর কথা ওঠাতে বললেন, "কাশীতে বেশ

ছিলুম গো, আর আমি ত সঙ্গে করে যদুবংশ সব নিয়ে গিয়েছিলুম, মা।”

একটু পরে চার-পাঁচটি স্ত্রীলোক এলেন। তাঁরা ডাব ও কিছু অন্য ফল মায়ের চরণপ্রান্তে রাখলেন। একটি স্ত্রীলোক প্রণাম করবার জন্য নিকটে আসবার উপক্রম করলে মা বললেন, “ওখান হতেই কর।” তাঁরা প্রত্যেকে মার সামনে ছু-চারটি পয়সা রেখে প্রণাম করতে লাগলেন। মা পয়সা দিতে বারবার নিষেধ করলেন; তাঁর কিছু উপদেশ চাইতে মা একটু হেসে বললেন, “আমি আর কি উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার, ত সব হয়ে যাবে।” শ্রীশ্রীমা খুঁটিনাটি অনেক কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বিদায় নিলে মা আমাকে বললেন, “উপদেশ নেয় তেমন আধার কই? আধার চাই মা, নইলে হয় না।” কথায় কথায় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় প্রভৃতির কথা উঠল; ছু-একটি কথা হতেই অন্নপূর্ণার মা ঘরে ঢুকতে সে-সব কথা চাপা পড়ে গেল। তিনি বললেন, “মা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন আমাকে বলছ, ‘আমার প্রসাদ খা, তবে তোর অসুখ সারবে।’ আমি বলছি, ‘ঠাকুর নিষেধ করেছেন,

আমাকে কারও উচ্ছিষ্ট খেতে।' তা মা আমাকে এখন তোমার প্রসাদ একটু দাও।" মা সম্মত না হওয়ায় তিনি খুব জিদ করতে লাগলেন।

মা বললেন, "ঠাকুর যা নিষেধ করেছেন, তাই করতে চাও ?"

অন্নপূর্ণার মা উত্তর করলেন, "মা, তাঁতে ও তোমাতে যতদিন তফাৎ বোধ ছিল, ততদিন ওকথা ছিল, এখন দাও।" মা শেষে তাঁকে প্রসাদ দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বিদায় নিলেন। গৌরীমার ওখান হয়ে যেতে হবে বলে আমিও একটু পরে বিদায় নিলুম।

৫ই কি ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৯— শ্রীমান্ শোকহরণের সহিত পুনরায় গিয়েছি। সকালবেলায় পূজা হয়ে গেছে। দেখেই মা বললেন, "এসেছ মা, বেশ করেছ। জয়রাম-বাটী যাবার দিন বদলে গেছে, ১৩ই নয় ১১ই (ফাল্গুন)। কার সঙ্গে এলে ?"

আমি—শোকহরণ নিয়ে এসেছে। অনেক দূরে আছি মা, আসবার সুবিধা হয় না।

মা শ্রীমানের প্রশংসা করে বললেন, "আহা, লক্ষ্মী ছেলে কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছে!" জিজ্ঞাসা করলেন, "জামাই (আমার স্বামী) কেমন আছেন ?"

আমি—বড় ভাল নেই মা।

কিছুক্ষণ পরে একখানি চিঠির জবাব লিখে দিতে বললেন। মা বলতে লাগলেন, আর আমি লিখে যেতে লাগলুম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা একটু বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক দর্শন করতে এলেন। মা শুয়ে শুয়েই তাঁদের কুশলপ্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁরা দু-একটি কথার পর বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার একটি ভাল ছাগল আছে, দু সের দুধ দেয়। তিনটি পাখী আছে। এই সবই এখন অবলম্বন। আর বয়স ত কম হয়ে গেল না, মা।" আমার তখন ঠাকুরের কথা মনে পড়ল—'বেড়াল পুষিয়ে মহামায়া সংসার করান।' শ্রীশ্রীমা "হাঁ-হাঁ" করে যেতে লাগলেন।

আহা! মা, আমাদের জন্য তোমাকে কতই না সইতে হয়! এই বিশ্রামটুকুর সময়েও যত রাজ্যের বাজে কথা! বৈকালে বেলা একটু পড়ে আসতে আমরা বিদায় নিলুম।

গত ১১ই ফাল্গুন মা পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন। ১৩২০ সনের আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বে কলিকাতা ফিরেছেন। একদিন বৈকালে গিয়ে দেখি, একটি

স্ত্রীলোক তাঁর পদতলে কাঁদছেন—দীক্ষার জন্য। শ্রীশ্রীমা চৌকীর উপর বসে আছেন। মা সম্পূর্ণ অসম্মত, বলছেন—"আমিত তোমাকে পূর্ব্বেই বারণ করেছি; কেন এলে? আমার শরীর ভাল নয়, এখন হবে না।" সে যতই বলছে, মা আরও বিরক্তি প্রকাশ করছেন, "তোমাদের আর কি? তোমরা ত মন্ত্রটি নিয়ে গেলে, তারপর?" মেয়েটি তবুও নাছোড়। উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষে মা বললেন, "পরে এস।" তখন স্ত্রীলোকটি বললে, "তবে আপনার কোন ভক্ত-ছেলেকে বলে দিন।"

মা—তারা যদি না শুনে?

মেয়েটি— সে কি, আপনার কথা শুনবে না?

মা—এ ক্ষেত্রে নাও শুনতে পারে।

তারপর কিছুতেই না ছাড়াতে মা বললেন, "আচ্ছা, খোকাকে * বলে দেবো, সে দেবে।" তবুও মেয়েটি বলতে লাগলেন, "আপনি দিলেই ভাল হয়, আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন।" এই বলে দশ টাকার একখানি নোট বের করে বললেন, "এই নিন টাকা যা লাগে আনিয়ে নেবেন।" ঐরূপ টাকা দিবার প্রস্তাবে আমাদের লজ্জা

---

* স্বামী সুবোধানন্দ—ডাক নাম 'খোকা' মহারাজ।

করতে লাগল, রাগও হল। মা এবার তাঁকে ধম্‌কে বললেন, "কি, আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ না-কি? আমি টাকায় ভুলি না, যাও, টাকা নিয়ে যাও।" ইহা বলে উঠে গেলেন।

পরে স্ত্রীলোকটির অনেক অনুনয়-বিনয়ে ঠিক হল মহাষ্টমীর দিন দীক্ষা হবে। মেয়েটি ত বিদায় নিলেন। মা এইবার পাশের ঘরে এসে বসে আমাকে ডাকলেন, "এস মা, এই ঘরে এস। এতক্ষণ তোমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, কেমন আছ?"

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, পূজার সময় বলে অনেক স্ত্রীলোক কাপড়, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। মা হাসিমুখে তাঁদের কথার উত্তর দিচ্ছেন। খুব গরম, আমি মাকে হাওয়া করতে লাগলুম। একটি মহিলা এসে সাগ্রহে আমার হাত থেকে পাখাখানা চেয়ে নিয়ে মাকে হাওয়া করতে লাগলেন। মায়ের একটু সামান্য সেবার কাজ করতে পেলেও সকলের কি আনন্দ! আহা, কি অপূর্ব্ব স্নেহ-করুণাতেই শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে চিরবদ্ধ করে গেছেন! আর তাঁর অবস্থানে বাগ-বাজারের মাতৃমন্দির সংসারতাপদগ্ধ মানুষের কি মধুর শান্তিনিলয়ই হয়েছিল, তা বলা বা বুঝান অসম্ভব!

এইবার আমিও রওনা হব। মাকে প্রণাম করতে

গিয়ে বললুম, "মা, শীঘ্রই একবার বাপের বাড়ী যেতে হবে।" মা সস্নেহে বললেন, "আবার শীগ্‌গির এস মা—চিঠিপত্র দিও।" মার জন্য একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, আসবার সময় বলছেন, "তোমার কাপড়খানি দেখিয়ে দিয়ে যাও মা—পরবো।"

প্রায় আড়াই মাস পরে আবার একদিন (১৪ই অগ্রহায়ণ) গিয়েছি। সিঁড়ি উঠতেই কল-ঘরে মার সঙ্গে দেখা হল। মা কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন। আধভিজে কাপড়েই এসে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, "এত দিন দেরিতে কেন এলে?" কাপড় কেচে এসে তক্তাপোশের উপর বসতে কুশলপ্রশ্নাদির পর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "সেই যে স্ত্রীলোকটি মন্ত্র নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর কি হল মা?"

মা—সে সেদিন নিতে পারলে না। বলেছিলুম, আমার অসুখ সারুক, তার পর নেবে—তাই হল। অসুখ হওয়ায় সেদিন সে আসতে পারে নি। তার অনেক পরে একদিন এসে নিয়ে গিয়েছে।

আমি—তাই ত মা আপনার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে পড়ে তাই হয়। আমরা আপনার ইচ্ছা না

মেনে নিজেরা কষ্ট পাই, আপনিও নিজের অসুস্থ শরীরে অনেক সময় দয়া করে দীক্ষা দিয়ে আমাদের ভোগ নিজ শরীরে নিয়ে আরও বেশী কষ্ট পান।

মা বললেন, "হাঁ মা, ঠাকুর ঐ কথা বলতেন। নইলে এ সব শরীরে কি রোগ হয়? এর মধ্যে আবার কলেরার মত হয়েছিল।"

আমার ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে গিয়েছিল। মা তাকে দেখে বললেন, "বেশ শান্ত বৌটি। এক বেন্ন ন নুনে পোড়া হলে মুশকিল হোত।" অর্থাৎ আমার ভ্রাতৃবধূ একটি মাত্র, সে ভাল না হলে তাকে নিয়ে সংসারে থাকা কষ্টকর হোত।

মাঘ, ১৩২০

একদিন সকালে গিয়েছি; বাগান থেকে অনেক-গুলি ফুল তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের নিকট উহা দিতে মা মহা আনন্দিত হয়ে ঠাকুরকে সাজাতে লাগলেন। নীল রংয়ের এক রকমের ফুল ছিল। সেইগুলি হাতে করে বললেন, "আহা, দেখছ কি রং! দক্ষিণেশ্বরে 'আশা' বলে একটি মেয়ে একদিন বাগানে কাল-কাল-পাতা একটি গাছ থেকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে হাতে নিয়ে খালি বলতে লাগল, 'এ্যাঁ, এমন লাল

ফুল, তার এমন কাল পাতা। ঠাকুর, তোমার একি সৃষ্টি!' এই বলে আর হাউ হাউ করে কাঁদে। ঠাকুর তাই দেখে তাকে বলছেন, 'তোর হল কি গো, এত কাঁদছিস কেন?' সে আর কিছু বলতে পারে না, খালি কাঁদে, তখন ঠাকুর তাকে অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন। আহা, এই ফুলগুলি কেমন নীল রং দেখ। ফুল না হলে কি ঠাকুর মানায়!" এই বলে মা অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল নিয়ে ঠাকুরকে দিতে লাগলেন। প্রথমবার দেবার সময় কয়েকটি ফুল সহসা তাঁর নিজের পায়ে পড়ে গেল দেখে বললেন, "ওমা, আগেই আমার পায়ে পড়ে গেল!" আমি বললুম, "তা বেশ হয়েছে।" মনে ভাবলুম, তোমার কাছে ঠাকুর বড় হলেও আমাদের কাছে তোমরা দুই-ই এক।

একটি বিধবা মহিলা এসেছেন। মাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন, "মাসখানেক হল দীক্ষা নিয়েছে। পূর্ব্বে অন্য গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েছিল। তা মা, মনের ভ্রান্তি, আবার এখানে নিলে। গুরু সবই এক, একথা বুঝলে না।"

দুপুরে প্রসাদ পাবার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে কামারপুকুরের কথা ওঠল। মা বললেন, "ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি

তখন ছেলেমানুষ বউটি ছিলুম গো। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, 'কাল এই এই সব রান্না কোরো গো।' আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচফোড়ন ছিল না, দিদি (লক্ষ্মীর মা) বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে।' ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন, 'সে কি গো, পাঁচফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়সের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে। সেই বামুন ঠাকরুণও (যোগেশ্বরী) তখন ওখানে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে মা বলতেন। আমিও তাঁকে শাশুড়ীর মত দেখতুম ও ভয় করতুম। তিনি বড় ঝাল খেতেন। নিজে রান্না করতেন—ঝালে পোড়া; আমাকে খেতে দিতেন, চোখ মুছতুম আর খেতুম। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে বলতুম, 'বেশ হয়েছে।' রামলালের মা বলত, হ্যাঁ, যে ঝাল হয়েছে।' আমি দেখতুম, তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন; বলতেন, 'বৌমা ত বলেছে ভাল হয়েছে। তোমার বাপু কিছুতে ভাল হয় না।

তোমাকে আর বেন্নুন দেব না।' " ইহা বলে মা খুব হাসতে লাগলেন।

আবার ফুলের কথা উঠল। মা বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গনফুল আর জুঁইফুল দিয়ে সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পড়াতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বারবার বলতে লাগলেন, 'আহা, কাল রংয়ে কি সুন্দরই মানিয়েছে!' জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এমন মালা গেঁথেছে?' আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন, 'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক!' বৃন্দে ঝি গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরাম বাবু, সুরেন বাবু—এঁরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন, আমি তখন কোথায় লুকুই। বৃন্দের আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জানতে পেরে বলছেন, 'ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন

এক মেছোনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস না।' তাঁর ঐ কথা শুনে বলরাম বাবুরা সরে দাঁড়ালেন। গিয়ে দেখি—মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন।" কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত আসাতে উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। আমারও যাবার সময় হয়ে এল। মা বললেন আমাকে একটি জিনিস দেবেন—কাপড় কেচে এসে।

আবার মুক্তির কথা উঠল। মা বললেন, "ও কি জান মা, যেন ছেলের হাতে সন্দেশ। কেউ কত সাধাসাধি করছে, 'একটু দে না, একটু দে না,' তা কিছুতেই দেবে না; অথচ যাকে খুশি হল, টপ করে তাকে দিয়ে ফেললে। একজন সারা জীবন মাথা খুড়ে কিছু করতে পারলে না, আর একজন ঘরে বসে পেয়ে গেল। যেমনি কৃপা হল, অমনি তাকে দিয়ে দিলে। কৃপা বড় কথা।" এই বলে কাপড় কাচতে গেলেন। বৈকালী ভোগের পর বেল-পাতায় মুড়ে আমাকে যা দেবেন বলেছিলেন দিয়ে বললেন, "মাদুলি করে পোরো। এটির কথা কাউকে বোলো না। তা হলে সবাই আমাকে ছিড়ে খাবে।" শ্রীশ্রীমাকে বালিগঞ্জে শ্রীমানের বাসায় যাবার কথা বললুম; মা বললেন—যাবেন। মা আমায় বললেন, "আমাকে একখানা শীতলপাটি দিও মা, আমি শোব।"

আমি—সে ত আমার সৌভাগ্য, অবশ্য আনব।

এই বলে প্রণাম করে বিদায় নিলুম। মা বললেন, "আবার এস।"

জ্যৈষ্ঠ, ১ম সপ্তাহ—১৩২১

আজ মা বালিগঞ্জের বাসায় আসবেন। পূর্ব্বদিন হতে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। মার জন্য পৃথক আসন, নূতন শ্বেতপাথরের বাসন ইত্যাদি কেনা হয়েছে। মা আসবেন। আনন্দে সারারাত ঘুমই হল না। কথা ছিল, মা অপরাহ্নে আসবেন। পাছে কোন কারণে তাঁর অন্য মত হয়, সেইজন্য প্রাতেই শ্রীমান্ শোকহরণ বাগবাজারে মার বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আর আমরা সংসারের কাজ সব সকাল সকাল চুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম। মায়ের আসন পেতে চারিদিকে ফুল সাজিয়ে রাখলুম, সমস্ত ঘরদোরে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলুম, ফুলের মালা গেঁথে রাখলুম এবং বড় দুটি ফুলের তোড়া করে মায়ের আসনের দুপাশে দিলুম। বেলা পড়তেই পথ চেয়ে আছি—কখন মা আসেন। এইবার এতক্ষণে সেই শুভ মুহূর্ত্ত। গাড়ীর শব্দ হতেই সকলে নীচে নেমে এলুম। গাড়ী

থামতেই দেখলুম, মা হাসিমুখে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে আছেন। গাড়ী হতে নামতেই সকলে তাঁর পদধূলি নেবার জন্য ব্যস্ত হলেম।

মায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, ছোটদিদি, নলিনীদিদি, রাধু এবং চার-পাঁচ জন সাধু-ব্রহ্মচারী এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে উপরে নিয়ে আসনে বসিয়ে প্রণাম করলুম। মা বললেন, "খেয়েছ ত? আমি কত তাড়াতাড়ি করেছি, কিন্তু কিছুতেই আর এর চেয়ে সকালে হয়ে উঠল না। এতক্ষণে তবে আসা হল।" ইহা বলে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। আমি আর বসতে পারলুম না, খাবারের আয়োজন করতে ও নিমকি ভাজতে হবে। আর সব খাবার ইতঃপূর্ব্বে ঠিক করা ছিল।

উপরে গ্রামোফোনে গান হচ্ছে। কাজ করতে করতে একটু ফাঁক পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি—মা কলের গান শুনে ভারী খুশি, আর "কি আশ্চর্য্য কল করেছে!" বলে বালিকার মত আনন্দ করচেন। খুব গ্রীষ্ম—মা বারান্দায় শীতলপাটিতে শুয়ে আছেন এবং তাঁর আশেপাশে সবাই বসে আছেন। একটি পাথরের বাটিতে বরফ-জল দেওয়া হয়েছে, মা মাঝে মাঝে খাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে মা বললেন, "ওগো, একটু বরফ-জল খেয়ে যাও।" মায়ের প্রসাদী জলটুকু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে

নীচে রান্নাঘরে আবার ছুটে এলুম। আজ এত তাড়াতাড়ি করেও যেন কাজ আর সেরে উঠতে পাচ্ছি নে।

সন্ধ্যার পরে পাশের ঘরে ভোগ সাজান হল। মা এসে গোলাপ-মাকে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করে দিতে বলতে তিনি বললেন, "তুমিই দাও, তুমি উপস্থিত থাকতে আমি কেন?" তখন শ্রীশ্রীমা নিজেই ভোগনিবেদন করতে বসলেন এবং "আহা, কি সুন্দর সাজিয়েছ!" বলে তারিফ করতে লাগলেন। এইরূপ সবেতেই বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করে আমাদের অপরিসীম আনন্দ দিতে লাগলেন। ভোগ দেওয়া হলে মা ও অন্য সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসলেন। সকলের আগে মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। বারান্দায় একখানি বেতের ইজি-চেয়ারে বসে আমায় ডেকে বলছেন, "ওগো, আমায় পান দিয়ে যাও।" আমি তখনও গোলাপ-মায়েদের পরিবেশন করছিলুম। তাড়াতাড়ি গিয়ে পান দিয়ে এলুম। মাকে পান চেয়ে খেতে হল বলে একটু লজ্জিতা হলুম। সুমতিকে বললুম, "পান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস্ নি, দেখছিস্ আমি এদিকে রয়েছি?" একটু পরে মা একবার নীচে কলতলায় গেলেন। আমি আলো নিয়ে সঙ্গে গেলুম। বাগানের এই দিকটি বেশ নির্জ্জন, পথে দু পাশে ক্রোটন্-গাছের

সার। মা সস্নেহে বললেন, "আহা, একটুও বসতে পেলে না কাজের জন্যে। যেয়ো ওখানে, তোমার মাকে নিয়ে যেয়ো।" আমার মা বেড়াতে এসেছিলেন। ভাগ্যক্রমে ঘরে বসেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়ে গেলেন।

তারপর বিদায়ের ক্ষণ এল। মোটরগাড়ীতে যেতে মায়ের মত নাই। কারণ একবার মাহেশে রথ দেখতে যেতে তাঁর মোটরের তলায় নাকি একটা কুকুর চাপা পড়ে, কিন্তু অত দূরে বাগবাজারে মোটরে না গেলে রাত হবে, কষ্টও হবে বলায় ভক্তদের মতেই শেষে রাজী হলেন। বারবার ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রস্তুত হলেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করে গাড়ীতে উঠলেন।

একদিন রাত্রে গিয়েছি। মা শুয়ে আছেন। কালো-বৌ (মা ঐ নামেই তাঁকে ডাকতেন) কাছে বসে আসেন। মা উঠে বসলেন প্রণাম করবো সেই-জন্য। প্রণাম করতেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে, আবার শয়ন করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "শোনো মা, বিধাতা যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন এক প্রকার সত্ত্বগুণী করেই করলেন। ফলে তারা জ্ঞান নিয়ে জন্মাল, সংসারটা যে অনিত্য তা বুঝতে আর তাদের দেরী হল না। সুতরাং তখনি তারা সব ভগবানের নাম

নিয়ে তপস্যা করতে বেড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর মুক্তি-পদে লীন হয়ে গেল। বিধাতা দেখলেন, তবে ত হল না। এদের দিয়ে ত সংসারে লীলা-খেলা কিছু করা চল্‌ল না। তখন সত্ত্বের সঙ্গে রজঃ তমঃ অধিক করে মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এবার লীলা-খেলা চল্‌ল ভাল।" এই পর্য্যন্ত বলে সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে সুন্দর একটি ছড়া বললেন। তারপর বললেন, "তখন মা, যাত্রা কথকতা এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর তেমনটি শোনা যায় না।" ইতোমধ্যে কালো-বৌ অন্য ঘরে উঠে গিয়ে নলিনীদিদি ও মাকুর কাছে কি একখানা বই চেঁচিয়ে পড়ছিল। মা তাই শুনে বললেন, "দেখ্‌ছ মা, অত চেঁচিয়ে পড়ছে, নীচে সব কত লোক রয়েছে, তা হুঁশ নেই।"

রাধারাণীর মা এসে বললেন, "লক্ষ্মীমণিরা নবদ্বীপে যাবে, তা তুমি আমায় তাদের সঙ্গে যেতে দিলে না।" ঐ কথা বলেই তিনি অভিমান করে চলে গেলেন। মা বললেন, "ওকে যেতে দেব কি মা, সে (লক্ষ্মী) হল ভক্ত, ভক্তদের সঙ্গে মিশে কত নাচবে গাইবে, হয়ত জাতের বিচার না করে তাদের সঙ্গে খাবে, *

* শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, ভক্তেরা এক আলাদা জাত, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের মত ইত্যাদি।

ও-ত সে সব ভাল বুঝবে না, দেশে এসে লক্ষ্মীর নিন্দে করবে। তুমি দেখেছ লক্ষ্মীকে ?”

আমি বললুম, “না, মা।”

মা—দক্ষিণেশ্বরেই ত আছে, দেখো। দক্ষিণেশ্বরে গেছ ত ?

আমি—হ্যাঁ মা, অনেক বার গেছি। তা তিনি যে সেখানে আছেন, তা জানতুম না।

মা—দক্ষিণেশ্বরে আমি যে নবতে * থাকতুম, দেখেছ ?

আমি—বাইরে থেকে দেখেছি।

মা—ভিতরে গিয়ে দেখো। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই সব সংসার ছিল—মায় ঠাকুরের জন্যে হাঁড়িতে করে মাছ-জিয়ান পর্য্যন্ত। প্রথমে যখন কলকাতায় আসি, আগে জলের কল-টল ত কিছু দেখি নি, একদিন কলঘরে † গেছি—দেখি কল সোঁসোঁ করে সাপের মত গর্জ্জাচ্ছে। আমি ত মা ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বল্‌ছি ‘ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁসোঁ করছে।’ তারা হেসে বললে, ‘ওগো, ও সাপ

---

* উত্তর দিকের নহবতের নীচের কুঠরিতে মা থাকতেন।

† কলিকাতা-কাঁসারীপাড়ায় গিরীশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী শ্রীশ্রীমার সহোদর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় তখন মা উঠেছিলেন।

নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি ত তখন হেসে কুটিপাটি।

ইহা বলেই মা খুব হাসতে লাগলেন। সে কি সরল মধুর হাসি! আমিও আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম—এমনি সরলই আমাদের মা বটেন!

মা—বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখেছ?

আমি—না মা, কখনো বেলুড়ে যাই নি। শুনেছি, সেখানে মেয়েদের গিয়ে গোল করা সাধু-ভক্তরা পছন্দই করেন না। সেই ভয়ে আরো যাই নি।

মা—যেয়ো না একবার, ঠাকুরের উৎসব দেখতে যেয়ো।

আর একদিন শ্রীশ্রীমা রাস্তার ধারে বারান্দায় এসে আমাকে আসনখানি পেতে হরিনামের ঝুলিটি এনে দিতে বললেন, তা এনে দিলে বসে জপ করতে লাগলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় সামনের মাঠে যেখানে কুলি-মজুর-গোছের কতকগুলি লোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করতো, সেখানে একজন পুরুষ সম্ভবতঃ তার স্ত্রীকে বেদম মার স্রুরু করে দিলে—কিল, চড়, পরে এমন এক লাথি মারলে যে, স্ত্রীলোকটির কোলে ছেলে ছিল, ছেলেশুদ্ধ গড়িয়ে এসে উঠানে পড়ে গেল। আহা, তার উপর এসে আবার কয়েক ঘা লাথি!

মায়ের জপ করা বন্ধ হয়ে গেল। একি আর তিনি সহ্য করতে পারেন? অমন যে অপূর্ব্ব লজ্জাশীলা, গলার স্বরটি পর্য্যন্ত কেহ কখনও নীচে থেকে শুনতে পেত না—একেবারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র ভৎসনার স্বরে বললেন, "বলি, ও মিন্‌সে, বৌটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বি নাকি, আঃ মলো যা!" লোকটা একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই অত যে ক্রোধোন্মত্ত হয়েছিল, যেন সাপের মাথায় ধূলোপড়া দেওয়ার মত অমনি মাথা নীচু করে বউটাকে তখনি ছেড়ে দিলে! মায়ের সহানুভূতি পেয়ে বউটির তখন কি কান্না! শুনলুম, তার অপরাধ—সে সময়মত ভাত রান্না করে রাখে নি। খানিক পরে পুরুষটার রাগ পড়ল এবং অভিমান ও সাধাসাধির পালা সুরু হল দেখে আমরাও ঘরে চলে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুকের স্বর রাস্তায় শোনা গেল—"রাধাগোবিন্দ, ও মা নন্দরাণী, অন্ধজনে দয়া কর মা" ইত্যাদি। মা শুনতে পেয়ে বললেন, "প্রায়ই রাতে এই রাস্তা দিয়ে ঐ ভিখারীটি যায়, 'অন্ধজনে দয়া কর, মা' আগে এই ওর বুলি ছিল। তা গোলাপ ও:কে সেদিন বলেছিল ভাল—'ওরে, সঙ্গে সঙ্গে এক-বার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর্। গৃহস্থেরও কানে যাক, তোরও নাম করা হোক্। তা নয়, অন্ধ অন্ধ করেই

গেলি।' সেই হতে ও এখানে এলেই এখন 'রাধা-গোবিন্দ' বলে দাঁড়ায়। গোলাপ ওকে একখানি কাপড় দিয়েছে, পয়সাও পায়।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি, শুনি মা বলছেন—"নূতন ভক্তদের ঠাকুরসেবা করতে দিতে হয়, কারণ তাদের নবানুরাগ, সেবা হয় ভাল। আর, ওরা সব সেবা করতে করতে এলিয়ে পড়েছে। সেবা কি করলেই হয় মা! সেবাপরাধ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তবে কি জান, মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।" জনৈকা সেবিকা কাছে ছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন কিনা বুঝতে পারলুম না—কেননা বললেন, "চন্দনে যেন খিচ না থাকে, ফুল-বিল্বপত্র যেন পোকা-কাটা না হয়। পূজো বা পূজোর কাজের সময় যেন নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐ সব করা চাই। আর ভোগরাগ সব ঠিক সময়ে দিতে হয়।"

রাত্রি প্রায় ৮৷৷টা। আজ গিয়ে দেখি, মা তখন ঠাকুরঘরের উত্তরে রাস্তার দিকের বারান্দায় অন্ধকারে বসে জপ করছেন। পাশের ঘরে আমরা বসবার খানিক পরে মা উঠে এলেন এবং হাসিমুখে বললেন, "এসেছ মা, এস।"

আমি—হ্যাঁ মা, আজ আমরা দু বোনে এসেছি। আরতি কি হয়ে গেছে?

মা—না এখনও হয় নি। তোমরা আরতি দেখ, আমি আস্‌ছি।

আরতি আরম্ভ হল। অনেকগুলি মহিলা ঠাকুরঘরে জপ করতে বসলেন। আরতি সাঙ্গ হলে আমরা প্রণাম করে মায়ের উদ্দেশে পাশের ঘরে গেলুম। ওখানে গেলে এক মুহূর্ত্তও মাকে চোখছাড়া করতে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে মা কাছে এসে বসলেন। একটি বৃদ্ধা অপর একজনের কাছে ভক্তি-রসাত্মক একটি গান শিখছিলেন। মা তাই শুনে বললেন, "হাঁ, ও যা শিখাবে—দু ছত্র বলে আবার দু ছত্র বাদ দিয়ে বলবে! আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর) যেন মধুভরা, গানের উপর যেন ভাসতেন! সে গানে কান ভরে আছে। এখন যে গান শুনি, সে শুনতে হয় তাই শুনি। আর নরেনের কি পঞ্চমেই স্থুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুস্থুড়ীর বাড়ীতে। বলেছিল, 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।' আমি বললুম, 'সে কি!' তখন বললে, 'না, না, আপনার আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই আসব।' আর গিরিশ

বাবু এই সে দিনও গান শুনিয়ে গেলেন। সুন্দর গাইতেন।"

রাধু এই সময় মাকে তার কাছে গিয়ে শুতে বলায় মা বললেন, "তুমি যাওনা, শোওগে। আহা, ওরা কত-দূর থেকে এসেছে, আমি এদের কাছে একটু বসি।" রাধু তবুও ছাড়ে না দেখে আমি বললুম, "আচ্ছা মা, চলুন ও ঘরেই (ঠাকুরঘরে) চলুন, শোবেন।" মা বললেন, "তবে তোমরাও এস।" আমরাও গেলুম। মা শুয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন এবং আমি বাতাস করতে লাগলুম। খানিক পরে মা বললেন, "এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, আর না।" আমি তখন পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে যোগশাস্ত্রের ষট্‌চক্রভেদ ও বিভিন্ন পদ্মের বীজাদি সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন। গোলাপ-মা বললেন, "ও সব বীজ-মন্ত্র অমন করে বলতে নেই।' তবু তিনি বলতে লাগলেন। মা ঐ সব কথা শুনতে শুনতে সহাস্যে আমাকে বললেন, "ঠাকুর নিজহাতে আমাকে কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র এঁকে দিয়েছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সেখানি কই, মা?"

মা—আহা মা, এত যে হবে তা কি তখন জানি? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না।

রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। আমরা প্রণাম করে বিদায় নিতে মা আশীর্ব্বাদ করে "তুর্গা তুর্গা" বলতে বলতে উঠে বসলেন। যাবার পূর্ব্বে একান্তে আমাদের বললেন, "দেখ মা, স্বামী-স্ত্রী একমত হলে তবে ধর্ম্ম-লাভ হয়।"

কার্ত্তিক, ১৩২১

আমাদের বালিগঞ্জের বাসায় ফুলের অভাব ছিল না। মা ফুল পেলে খুব খুশি হন বলে অনেক ফুল যোগাড় করে নিয়ে একদিন ভোরে মায়ের কাছে গেলুম। দেখি মা সবে পূজার আসনে বসেছেন। আমি ফুলগুলি সাজিয়ে দিতে ভারি খুশি হয়ে পূজায় বসলেন। শিউলি ফুল দেখে বললেন, "এ ফুল এনে বেশ করেছ। কার্ত্তিক মাসে শিউলি ফুল দিয়ে পূজো করতে হয়। এবার আজ পর্য্যন্ত এই ফুল ঠাকুরকে দেওয়া হয় নি।"

আমি আজ মায়ের শ্রীচরণপূজার ফুল আলাদা করে রাখি নি। সেজন্য ভাবলুম, 'আজ আর বোধ হয় মাকে পূজা করা হবে না'; কিন্তু ফলে দেখলুম আমার ঐরূপ ভাববার আগেই মা সকল কথা ভেবে রেখেছেন। কারণ, সমস্ত ফুলগুলিতে চন্দন মাখিয়ে মন্ত্রদ্বারা পুষ্প-শুদ্ধি করে নিয়ে পূজা করতে বসবার সময় দেখলুম তিনি থালার পাশে কিছু ফুল আলাদা করে রেখে

দিলেন। পরে, পূজাশেষ হলে উঠে বললেন, "এস গো মা, ঐ থালায় তোমার জন্য ফুল রেখেছি, নিয়ে এস।" এই সময় একটি ভক্ত অনেকগুলি ফল নিয়ে মাকে দর্শন করতে উপস্থিত হলেন। ভক্তটিকে দেখে মা খুব আনন্দিত হলেন, কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। কোন পুরুষ-ভক্তকে ঐরূপ আদর করিতে আমি এ পর্য্যন্ত মাকে দেখি নি। তারপর আমাকে বললেন, "মা, তোমার ঐ ফুল হতে চারটি ওকে দাও ত।" আমি দিতে গেলে ভক্তটি অঞ্জলি পেতে ফুল নিলেন। দেখ্‌লুম ভক্তির প্রবাহে তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। তিনি সানন্দে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন এবং প্রসাদ নিয়ে বাহিরে গেলেন। শুনলুম তিনি রাঁচি হতে এসেছেন। তক্তোপোষখানিতে বসে মা এইবার সস্নেহে আমাকে ডেকে বললেন, "এইবার এস গো।" আমি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে উঠতেই মা চুমো খেয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। এইবার আমরা পান সাজতে গেলুম। পান সেজে এসে মাকে খুজতে গিয়ে দেখি—মা ছাদে চুল শুকাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এস, মাথার কাপড় ফেলে দাও, চুল শুকিয়ে নাও, অমন করে ভিজে চুলে থেকো না, মাথায় জল বসে চোখ খারাপ হয়।"

এর মধ্যে আর একটি স্ত্রী-ভক্তও তথায় উপস্থিত হলেন। ছাদে অনেকগুলি কাপড় শুকাচ্ছিল, মা আমাকে সেইগুলি তুলে কুঁচিয়ে রাখতে বললেন। আমি কাপড়গুলি তুলছি, এমন সময় গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকে ডেকে নীচে নেমে আসতে বললেন; কারণ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। মা নীচে নেমে গেলেন। আমিও খানিক পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখি—মা সলজ্জা বধূটির মত ঠাকুরকে বলছেন, "এস, খেতে এস।" আবার গোপাল-বিগ্রহের কাছে বলছেন, "এস গোপাল, খেতে এস।" আমি তখন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেসে বললেন, "সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।" এই কথা বলে মা ভোগের ঘরের দিকে চললেন। তাঁর তখনকার ভাব দেখে মনে হল যেন সব ঠাকুররা তাঁর পিছনে চলেছেন। দেখে খানিক ক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ভোগের ঘর (সর্ব্বদক্ষিণের ঘর) হতে ফিরে এসে মা পাশের ঘরে সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন। আহারান্তে পাশের ঘরে বিছানা করে দিলুম, মা শয়ন করলেন। কাছে বসতেই মা বললেন, "শোও, এই খেয়ে উঠেছ।" শুয়েছি, মায়েরও একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময় বলরাম বাবুর বাড়ীর চাকর "ঠাকুর-

মা, ঠাকুর-মা" করে ডেকে ঠাকুরঘরে কতকগুলি আতা রেখে গেল। একটি চুপ্‌ড়িতে আতা ছিল, লোকটি নীচে সাধুদের কাছে গিয়ে চুপ্‌ড়িটি কি করবে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, "ও আর কি হবে, রাস্তায় ফেলে দে।" সে ফেলে দিয়ে চলে যেতেই মা উঠলেন এবং ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় গিয়ে আমাকে ডেকে বল্লছেন, "দেখেছ কেমন সুন্দর চুপ্‌ড়িটি! ওরা তখন ফেলে দিতে বললে। ওদের কি? সাধু মানুষ, ও সবে কি আর মায়া আছে? আমাদের কিন্তু সামান্য জিনিসটিও অপচয় করা সয় না। ওটি থাকলে তর-কারির খোসাও রাখা চলত।" এই বলে চুপ্‌ড়িটি আনিয়ে ধুইয়ে রেখে দিলেন। মার এই কথায় ও কাজে আমার বেশ একটু শিক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু, 'স্বভাব যায় না মলেও।'

কিছুক্ষণ পরে নীচে একজন ভিক্ষুক এসে 'ভিক্ষে দাও' বলে চীৎকার করছিল। সাধুরা বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়া দিয়ে উঠেছেন, "যাঃ, এখন দিক্ করিস্ নে।" মা তাই শুনতে পেয়ে বললেন, "দেখেছ দিলে ভিখারীকে তাড়িয়ে! ঐ যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এইটুকুও আর পারলে না, আলস্য হল। ভিখারীকে এক মুঠো ভিক্ষা দিতে পারলে না।

যার যা প্রাপ্য, তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারির খোসাটা, এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।"

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে কিছু প্রসাদ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলুম।

আজ সন্ধ্যায় গেছি। কাছে হবে বলে এখন বাগ-বাজারের বাসায় আছি এবং রোজই প্রায় শেষ বেলায় মার কাছে যাই। নিরিবিলি দেখে আজ তাঁকে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বললুম, "মা, একদিন স্বপ্নে দেখি—আপনি তখন জয়রামবাটীতে, আমি যেন সেখানে গিয়েছি। ঠাকুরকে সামনে দেখে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মা কোথায়?' তিনি বললেন, 'ঐ গলি ধরে যাও, খড়ের ঘরে সামনের দাওয়ায় বসে আছে'।" মা শয়ন করেছিলেন, উৎসাহে একেবারে উঠে বসে বললেন, "ঠিক মা, ঠিকই ত দেখেছ?"

আমি—সত্য না-কি মা? আমার কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল, আপনার পিত্রালয় ইটের কোঠাবাড়ী। তাই মাটির দাওয়া, খড়ের চালা দেখে ভাবলুম মনের ভ্রান্তি।

'ভগবানের জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন' এই কথা-

প্রসঙ্গে মা এখন বললেন, "আহা গোলাপ, যোগীন ওরা কত ধ্যান-জপ করেছে! যোগীন কতবার চাতুর্ম্মাস্য করেছে—একবার শুধু কাঁচা দুধ ও ফল খেয়ে ছিল! এখনও কত জপ-ধ্যান করে! গোলাপের মনে বিকার নেই, দিলে হয় ত খানিকটা দোকানের রাঁধা আলুর দমই খেয়ে।"

আজ মায়ের বাড়ীতে কালীকীর্ত্তন হবে। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজেরাই কীর্ত্তন করবেন। রাত প্রায় সাড়ে আটটায় কীর্ত্তন আরম্ভ হল। মেয়েরা গান শুনবার জন্য অনেকেই বারান্দায় গেলেন। আমি মায়ের পায়ে তেল মালিস করে দিচ্ছিলুম। ওখান হতেও বেশ শুনা যাচ্ছিল। এই সব গান আরও কতবার শুনেছি, কিন্তু ভক্তদের মুখে গানের শক্তি যেন আলাদা—কতই ভাবপূর্ণ বোধ হল। চোখে জল আসতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সব গান করতেন, মাঝে মাঝে যখন সেই গান দু-একটি হচ্ছে, মা সোৎসাহে বলতে লাগলেন, "এই গো, এইটি ঠাকুর গাইতেন।" তারপর যখন 'মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে'—এই গানটি আরম্ভ হল তখন মা আর শয়ন করে থাকতে পারলেন না—চোখে দু-এক ফোঁটা অশ্রু, উঠে বললেন, "চল মা, বারান্দায় গিয়ে শুনি।" কীর্ত্তনশেষ হলে মাকে প্রণাম করে বাসায় ফিরলুম।

২রা জৈষ্ঠ, ১৩২৫

বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হ'তে এসেছেন। ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগে দেহ জীর্ণশীর্ণ। একটু সুস্থ হলেই দেখা করা উচিত মনে করে এবং তাঁর অসুস্থ শরীর বলে এখনও কাউকে বড় একটা দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছে না শুনে এতদিন দেখতে যাই নি। পরে 'মেয়েদের আসতে বাধা নাই'—আজ এই মর্ম্মে চিঠি পেয়ে গিয়ে দেখি, মা পাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। আমাকে দেখেই বললেন, "এস মা, এতদিনে এলে গো।"

"হ্যাঁ মা, কবেই ত আসতুম, কিন্তু শুনেছিলুম এখনও আপনার অসুখের জন্য আপনার ভক্ত-ছেলেরা সকলের অবাধ আসাটা পছন্দ করছেন না, তাই এতদিন আসি নি। আপনার জন্যে আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, আর আপনি বাপের বাড়ী গিয়ে এতদিন আমাদের বেশ ভুলে ছিলেন। তা আপনার ত সর্ব্বত্রই ছেলেমেয়ে রয়েছে, অভাব ত নেই।"

মা হেসে বললেন, "না মা, না, তোমাদের কারও কথা আমি ভুলি নি, সকলের কথাই মনে করেছি।"

"আপনার অসুখ শুনে আমরা ত ভয়েই মরি, না জানি কেমন আছেন।"

"আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি মা, দেখ না পায়ে হাতে কি ছালচামড়াটা উঠে যাচ্ছে।"

পায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যই ঐরূপ হয়েছে।

একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, দিতেই মা বলছেন, "বেশ কাপড়খানি এনেছ, মা, এবার কাপড় কমও আছে, পুজোর সময় ত এখানে ছিলুম না। বউ-মা সেদিন এসেছিল। তারা সব ভাল আছে?" শ্রীমান্ শোক-হরণের কথা জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তার এখন কি করে চলছে? কাজকর্ম্ম-চাকরি কিছুরই ত এখন সুবিধা নেই। কি পোড়া যুদ্ধই লেগেছে! কতদিনে যে থামবে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে! তা এ যুদ্ধটা গোড়ায় লাগল কেন বলত, মা?" আমি কাগজপত্রে যা পড়েছিলুম কিছু কিছু বলতে লাগলুম।

অধিক কথা কইলে পাছে তাঁর অসুখ বাড়ে এই ভেবে আজ অল্পক্ষণ থেকেই বিদায়গ্রহণ করলুম।

৬ই শ্রাবণ, ১৩২৫

রাত সাড়ে সাতটা, মায়ের শ্রীচরণদর্শনে গিয়েছি, প্রণাম করতেই বললেন, "এস মা, বস। ভারি গরম, বসে একটু ঠাণ্ডা হও। তারা গিয়ে পৌঁচেছে—সুমতিরা?"

"হ্যাঁ মা, তারা গেলে পরেই আমি এসেছি।"

মা—একখানা পাখা রাধুকে দিয়ে এস, আর এই মরিচাদি তেলটা নাও। পিঠে মালিশ করে দাও। দেখেছ মা, হাতে পেটে আর জায়গা নেই—আমবাতে ঘামাচিতে ভরে গেছে।

আমি মালিশ করতে বসতেই আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। মা উঠে বসে করজোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। অন্য সকলে আরতি দেখতে ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

মা—দেখ মা, সকলেই বলে 'এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।' কিন্তু দুঃখই ত ভগবানের দয়ার দান।

সেদিন আমার মনটা বড় দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল, তাই কি মা টের পেয়ে ঐ কথাগুলি বললেন? মা বলতে লাগলেন, "সংসারের দুঃখ কে না পেয়েছে বল? বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে, 'কে বলে তোমাকে দয়াময়? রাম-অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ-অবতারে রাধাকে কাঁদাচ্ছ। আর কংস-কারাগারে দুঃখ-কষ্টে দিনরাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেছে তোমার পিতামাতা। তবে যে তোমাকে ডাকি, তা এইজন্য যে তোমার নামে শমনভয় থাকে না।' "

শচীন ও দেবব্রত মহারাজের কথা উঠল। মা বললেন, "শচীন বড় ভাগ্যবান ছিল। দেবব্রত যে রাতে

দেহ রাখলে সেই রাতে বৃষ্টি ঝড়, লোকজন এ মঠে তেমন কেউ ছিল না। আর শচীন সকালে গেল—মঠ লোকে ভরপুর।"* দেবব্রত মহারাজের কথায় বললেন, "দেবব্রত যোগী পুরুষ ছিল।"

একটি স্ত্রীলোকের কথা উঠল। মা বললেন, "ওরূপ চেহারার লোকের ভক্তি বড় একটা হয় না—ঠাকুর বলতেন শুনেছি।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মা, আবার কান-তুলসে, ভিতরবুঁদে ইত্যাদি আছে, ঠাকুরের বইয়ে পড়েছি।"

মা—ওঃ সেই কথা বলছ! সে নারায়ণদের বাড়ী গিয়ে ওকথা হয়েছিল। একজন একটি স্ত্রীলোককে রেখেছিল। সে স্ত্রীলোকটি এসে ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করে বলেছিল, 'ওই ত আমাকে নষ্ট করেছে। তারপর আমার যত গহনা, টাকা ছিল সে সবও নিয়েছে।' ঠাকুর ত সকলের অন্তরের সব কথাই জানতে পারতেন, তবু জিজ্ঞাসা করতেন। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন, 'তাই নাকি? মুখে কিন্তু ওত খুব ভক্তির কথা সব বলে।' ঐ কথা বলে তিনি ঐ শ্লোকটি বললেন।

* দেবব্রত মহারাজ যখন দেহত্যাগ করেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের (দেশে) কোয়ালপাড়ায় খুব অসুখ। তজ্জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সব তথায় গিয়েছিলেন, শচীন মহারাজ যখন দেহ রাখেন তখন সকলেই এখানে, শ্রীশ্রীমাও ছিলেন।

যা হোক্, মাগী ত তাঁর কাছে পাপের কথা সব ব্যক্ত করে খালাস পেয়ে গেল।

নলিনী—তাকি হয়, মা? পাপের কথা একবার মুখে বললে, আর সব ধুয়ে গেল—তাই যায় কি?

মা—তা যাবে না? তিনি যে মহাপুরুষ, তাঁর কাছে বললে যাবে না? আর এক কথা শোন, পাপ-পুণ্যপ্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাদের সকলকেই সেই ভালমন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়।

নলিনী—তা কেন হবে?

মা আমাদের বললেন, "শোন, মা, কেমন করে হয়। মনে কর, একজন তোমাদের কাছে তার পাপপুণ্যের কথা বলে গেল। মনে কখনও সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভালমন্দ কাজগুলিরও চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই ভাল বা মন্দ দুই-ই তোমাদের মনের উপর একটু কাজ করে যাবে। কি বল, মা, তাই না?"

আবার লোকের দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কথা ওঠায় মা বলতে লাগলেন, "দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, বলে জীবনে বড় অশান্তি, ইষ্টদর্শন পেলুম না। কিসে শান্তি হবে মা! কত কি বলে। আমি তখন তাদের

দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি—এরা এমন সব কথা কেন বলে! আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক! আমি অশান্তি বলে ত কখনো কিছু দেখলুম না! আর ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই।"

মার 'ডাকাত বাবার' কথাটি বইয়ে পড়েছিলুম। তাঁর নিজমুখ হতে সেইটি শোনবার ইচ্ছা হওয়ায় মাকে এখন জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, বইয়ে পড়েছি একবার আপনি দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। আপনি না-কি তাঁদের সমান দ্রুত চলতে না পেরে ও সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে তাঁদের এগিয়ে যেতে বলে নিজে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন, এমন সময়ে আপনার সেই বাগ্‌দি মা-বাপের সঙ্গে দেখা হয়।"

মা—আমি একেবারে একলা ছিলুম, তা ঠিক নয়। আমার সঙ্গে আরও দুজন বৃদ্ধা-গোছের স্ত্রীলোক ছিলেন—আমরা তিন জনেই পিছিয়ে পড়েছিলুম। তারপর সেই রূপোর বালা পরা, ঝাঁকরা চুল, কালো রং, লম্বা লাঠি হাতে পুরুষটিকে দেখে আমি বড্ড ভয় পেয়েছিলুম। তখন ওপথে ডাকাতি হোত। লোকটি, আমরা যে ভয় পেয়েছি, তা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে গা, তোমরা কোথায় যাবে?' আমি বললুম, 'পূবে'। লোকটি

বললে, 'সে এ পথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।' আমি তবুও এগুই নে দেখে সে তখন বললে, 'ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে।' তখন 'বাপ' ডেকে তার আশ্রয়ে যাই। তখন কি এমনি ছিলুম, মা? কত শক্তি ছিল, তিন দিনের পথ হেঁটে এসেছি, বৃন্দাবন-পরিক্রমা করেছি, কোন কষ্ট হয় নি।

তারপর মা বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কল্‌কাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো'। (নলিনী ও মাকুকে লক্ষ্য করে)—তোরা হলে কি একদিনও সেখানে থাকতে পারতিস?"

তাঁরা বললেন, "না পিসীমা, তোমার সবই আলাদা।"

আমি বললুম, "গুরুদাস বর্ম্মণের বইয়ে পড়েছি, শেষে না-কি আপনাকে একখানি আটচালা ঘর করে দিয়েছিল এবং ঠাকুর একদিন সেই ঘরে গিয়ে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় নিজের ঘরে আসতে পারেন নি।"

মা—কৈ , মা, কোথায় আটচালা? অমনি চালা ঘর। শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে। মাষ্টারের বইও বেশ—যেন ঠাকুরের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছে। কি মিষ্টি কথা! শুনেছি, ঐ রকম বই আরও চার-পাঁচ খণ্ড হতে পারে এমন আছে। তা এখন বুড়ো হয়েছে, আর পারবে কি? বই বিক্রি করে অনেক টাকাও পেয়েছে—শুনেছি সে টাকা সব জমা রেখেছে। আমাকে জয়রামবাটীতে বাড়ীটাড়ী করতে প্রায় এক হাজার টাকা দিয়েছে (বাড়ীর জন্য ৪০০৲ ও খরচের জন্য ৫০০৲) আর মাসে মাসে আমাকে দশ টাকা দেয়। এখানে থাকলে কখনো কখনো বেশী—বিশ পঁচিশ টাকাও দেয়। আগে যখন স্কুলে চাকরি করত, তখন মাসে দু টাকা করে দিত।

আমি—গিরিশবাবু না-কি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন?

মা—সে আর কি দিয়েছে? বরাবর দিয়েছিল বটে সুরেশ মিত্তির। তবে হ্যাঁ, কতক কতক দিয়েছে বই কি। আর আমাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়ীতে। দু হাজার, পাঁচ হাজার মঠে যে দিয়েছে তা নয়। দেবেই বা কোত্থেকে? তেমন টাকাই বা কোথা ছিল? আগে ত পাষণ্ড ছিল, অসৎসঙ্গে

থিয়েটার করে বেড়াত। বড় বিশ্বাসী ছিল, তাই ঠাকুরের অত কৃপা পেয়েছিল। এবারে ঠাকুর ওর উদ্ধার করে গেলেন। এক এক অবতারে এক এক পাষণ্ড উদ্ধার করেছেন; যেমন গৌর-অবতারে জগাই-মাধাই—এই আর কি। ঠাকুর এক সময়ে এও বলেছিলেন, 'গিরিশ শিবের অংশ।' টাকাতে কি আছে মা? ঠাকুর ত টাকা ছুঁতেই পারতেন না। হাত বেঁকে যেত। তিনি বলতেন, 'জগৎটাই যে মিথ্যা। ওরে রামলাল, যদি জানতুম জগৎটা সত্যি তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি ও সব কিছু না—ভগবানই সত্যি।'

মাকু আক্ষেপ করছে, 'কী—এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পারলুম না!' মা বললেন, "থির কিগো? যেখানে থাকবি সেইখানেই থির। স্বামীর কাছে গিয়ে থির হবি ভাবছিস, সে কি করে হবে? তার অল্প মাইনে, চলবে কি করে? তুই ত (এখানে যেন) বাপের বাড়ীতেই রয়েছিস। বাপের বাড়ী লোকে থাকে না? এই ছ্যাখ্ না, এ রয়েছে নিজের সংসার ছেড়ে। তোরা এতটুকু ত্যাগ করতে পারিস নে? ছ্যাখ্ না একে, কি শান্ত মূর্ত্তি! আর আমি আছি বলে আছে, আর তোরা থাকতে পারিস্ নে?"

আমি—থাক্ মা, ঠাকুরের কথা আর একটু বলুন।

মা—বইয়ে যে লেখে, সব ঠিক হয় না। আমাকে যে ঠাকুর ষোড়শীপূজা করেছিলেন সে কথা রামের বইয়ে যা লিখেছে তা ঠিক হয় নি।

ঘটনাটি বলে শেষে বললেন, "বাড়ীতে তো নয়ই—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল বারান্দার কাছে গঙ্গাজলের জালাটি রয়েছে ঐখানে। হৃদয় আয়োজন করে দিয়েছিল।"

এই সময়ে যোগেন-মা এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কি কথা বলতে যেতেই মা তাঁকে বললেন, "এদিকে এস-না, তোমাদের যে দেখতেই পাই নে।" যোগেন-মা হাসতে হাসতে মার কাছে এলেন। আসবার সময় আমার গায়ে তাঁর পা ঠেকে গেল। তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করছেন দেখে আমি শশব্যস্তে উঠে প্রণাম করে বলছি, "একি যোগেন-মা, যে আপনার চরণধূলিরও যোগ্যা নয় তার গায়ে পা ঠেকেছে বলে প্রণাম!"

যোগেন-মা—সে কি মা! ছোট সাপটাও সাপ, বড় সাপও সাপ, তোমরা সব ভক্ত যে!

মায়ের পানে চেয়ে দেখি মুখে সেই করুণামাখা হাসি। রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে কিছুক্ষণ পরে প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫

সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। এখনও আরতি আরম্ভ হয় নি। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটি আসন পেতে বসে জপ করছেন। ভারি গরম, কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা বাতাস করবার জন্য পাখাখানি হাতে দিলেন। বাতাস করছি, এমন সময় একটি বর্ষীয়সী বিধবা এসে মাকে প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে এলে?"

"দারোয়ানের সঙ্গে এসেছি" বলে তিনি আমার কাছে পাখাখানি চাইলেন—মাকে বাতাস করবেন। আমি তখনি দিলুম।

মা বললেন, "থাক্, থাক্, ও-ই দিক্।"

তিনি বললেন, "কেন মা, আমার হাত দিয়ে একটু হবে না? ওরা ত দিচ্ছেই।" মা যেন একটু বিরক্ত হলেন। তিনি দু-এক মিনিট বাতাস করেই বললেন, "তবে আসি মা, মহারাজের কাছে একবার যেতে হবে।" মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা মহা বি[illegible] হয়ে বললেন, "আঃ, পায়ে কেন? একে ত [illegible] খারাপ—ঐ করে করে ত এই সব (অসুখ) [illegible]" তিনি চলে যাবার পরে জল দিয়ে পা ধুয়ে ফেল[illegible]।

বিধবা স্ত্রীলোকটি গোলাপ-মাকে একটু দেখে এসে (তাঁর খুব অসুখ) পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। মা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস গে।" এর পূর্ব্বে মাকে কারও সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আমি চক্ষে দেখি নি।

পরে মা আমাকে বললেন, "আমার আসনখানা তুলে ঘরে নিয়ে যাও আর বিছানাটা নীচে পেতে দাও।" মা এসে শয়ন করলেন এবং হাঁটুতে ঘি মালিশ করে দিতে বললেন। কিছু পরে বললেন, "এখন পিঠে মরিচাদি তেল মালিশ করে দাও।"

ললিত বাবুর কথা উঠল। আমি বললুম, "মা, তিনি ত শুনেছি আপনার কৃপাতেই বেঁচে গেছেন।"

মা—তার অনেক বাসনা ছিল। তার যা অবস্থা হয়েছিল মা, বালতি বালতি জল বেরুত পেট থেকে। একবারে শেষ অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল। তখন বড় কাতর হয়ে বললে, 'মা, কামারপুকুরে, জয়রামবাটীতে মন্দির করব, হাসপাতাল দেবো, আমার বড় আশা ছিল, কিছুই করতে দিলি নি।' আহা! ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। ওখানে সব করবার ইচ্ছা, ওর মত আর কোন ভক্তের নেই। বেঁচেছে, এখন কাজ করুক। আমাকে একটি পুকুর কিনে দিয়েছে।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ বৈকালে প্রেমানন্দ স্বামিজী দেহত্যাগ করলেন। রাত্রে মায়ের নিকট গেলুম। মা বললেন, "এসেছ মা, বস। আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে।" ইহা বলে কাঁদতে লাগলেন। "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীরে আলো করে বেড়াত। বাবুরামের মা ছিল আঁটকুড়ো ঘরের মেয়ে, বাপের বিষয় পেয়েছিল। সে জন্যে একটু অহঙ্কার ছিল। নিজেই বলত, 'হাতে বাউটি, কোমরে সোনার চন্দ্রহার পরে মনে করতুম ধরা যেন সরা।' চারিটি সন্তান রেখে সে গেছে। একটি কেবল তার পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল।"

খানিক পরে দেখি, মাঝের ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণস্বরে বলছেন, "ঠাকুর, নিলে!"—সে কি মর্ম্মভেদী স্বর! আমাদেরও বড় কান্না পেতে লাগল।

এদিকে গোলাপ-মার খুব অসুখ—মরণাপন্ন রক্তামাশয় চলেছে।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫

রাত সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে বসে আছেন।

গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "বারান্দায় আমার আসনখানি পেতে দাও ত মা, আর তক্তাপোশের পাশে মেজেয় পাতা ঐ বিছানাটা গুটিয়ে রাখ, আরতির সময় ওরা ওখানে বসে ঝাঁজ বাজাবে।" বিলাস মহারাজ আরতির আয়োজন করছিলেন। বারান্দায় আসন পেতে দিতে, মা বললেন, "কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে, নিয়ে এস।" গঙ্গাজলে হাতমুখ ধুয়ে জপে বসলেন এবং পাখাখানি আমার হাতে দিয়ে বাতাস করতে বললেন। একটু পরেই আরতি আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীমা "গুরুদেব গুরুদেব" বলে জোড়হাতে প্রণাম করলেন এবং জপ, শেষ করে আরতি দেখতে লাগলেন। আরতি হয়ে গেলে বিলাস মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে বললেন, "মা, আজ ভারি গরম।" মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "একটু বাতাস করবে?"

তিনি বললেন, "কে করবে মা?"

"কেন, এই মা করবে, করতো মা।" আমি তাঁর দিকে দু-একবার বাতাস করতেই তিনি বললেন, "না মা, উনি আপনাকে বাতাস করছেন আপনাকেই করুন।" ইহা বলে বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা প্রেমানন্দ স্বামিজীর কথা তুলে বললেন, "দেখ মা, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু

ছিল না, কেবল কাঠামখানি ছিল।" এমন সময়ে চন্দ্রবাবু উপরে এসে ঐ কথায় যোগ দিলেন এবং বাবুরাম মহারাজের দেহসংকারের জন্য কয়েকজন ভক্ত যে চন্দনকাঠ, ঘি, ধূপ, গুগ্গুল, ফুল ইত্যাদি চার-পাঁচ শ টাকার জিনিস দিয়েছেন তাই বলতে লাগলেন। মা বললেন, "আহা! ওরাই টাকা সার্থক করে নিলে। ঠাকুরের ভক্তের জন্য দেওয়া। ভগবান ওদের দিয়েছেন, আরও দেবেন।" চন্দ্রবাবু প্রণাম করে উঠে গেলেন। মা বলতে লাগলেন, "শোন মা, যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাৎ এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, আর ওঁরা যান হেসে হেসে—মৃত্যুটা যেন খেলা।

"আহা! বাবুরাম আমার বালককালে এসেছে। ঠাকুর কত রঙ্গের কথা বলতেন, আর নরেন বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটিপাটি হোত। একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধশুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ ত গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন, 'তাই ত বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায়

খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস্?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম ত হেসে খুন। এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তারপর তিন দিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও-কয়দিন গোলাপ মা কে মণ্ড তৈরী করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।

"বাবুরাম তার মাকে বলত, 'তুমি আর আমাকে কি ভালবাস? ঠাকুর আমাদের যেমন ভালবাসেন, তুমি তেমন ভালবাসতে জান না।' সে বলত, 'আমি মা, আমি ভালবাসি না, বলিস্ কিরে?' এমনি তাঁর ভালবাসা ছিল। বাবুরাম চার বছরের সময়েই বলত, 'আমি বে করব না—বে দিলে মরে যাব।' ঠাকুর যখন বলেছিলেন, 'আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ মুখে খাব', বাবুরাম বলেছিল, 'তোমার লক্ষ টক্ষ আমি চাই নে, আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব।'

"অনেকগুলো ছেলেপিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে

গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু!"

গোলাপ-মার অসুখ আজ একটু কম। কি ঔষধ দিয়ে ডুস দেওয়া হয়েছে—সরলা এসে বললেন; ডাক্তার বিপিনবাবু বলেছেন, "তিন মাস লাগবে সারতে।"

মা বললেন, "রক্তামাশয় কি সোজা ব্যারাম! তা লাগবে বই কি। ঠাকুরের অমনি আমের ধাত ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় (বর্ষাকালে) প্রায় আমাশয় হোত। নবতের দিকের লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাঠের বাক্স ফুটো করে নীচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শৌচে যেতেন। আমি সকালেরটা ফেলে আসতুম। বিকালেরটা ওরা ফেলতো। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে, বললে কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙ্গুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার করে তাত দিতে মলদ্বারের ফুলো টন্‌টনানি কমে গেল। আমি তখন ভাবতুম—একে আমাশয়, তাতে গরম সেক, বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ী* থেকে নবতে

* দক্ষিণেশ্বরে—গ্রামের ভিতরে এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদার বাড়ী হয়েছে, তার পাশেই তখন শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য কুঁড়েঘর হয়েছিল। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারও তথায় থাকতেন।

নিয়ে এসেছিল ; বললে, 'মা, তাঁর এমন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে?' আমি বললুম, 'কি করবো, ভাগ্নে-বউটি একা থাকবে, ভাগ্নে (হৃদয়) সেখানে ঠাকুরের কাছে রয়েছে।' মেয়েটি বললে, 'তা হোক্, ওরা লোকটোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে?' আমি তার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে চলে এলুম। কয়েক দিন পরে তিনি একটু সারলে সে মেয়েটি চলে গেল। কোথায় গেল আর কোন খোঁজ পেলুম না। তারপর আর দেখা হয় নি। সে আমার বড় উপকার করেছে। কাশী গিয়েও তাঁর খোঁজ করেছিলুম, পাই নি। তাঁর (ঠাকুরের) প্রয়োজনে সব কোথা হতে আসত, আবার কোথা চলে যেত।

"আমিও এক বছর আমাশয়ে ভুগিছি, মা। সে কি শরীর হয়ে গেল। দেশে আমাদের কলু-পুকুরের ধারে শৌচে যেতুম। বারবার যেতে কষ্ট হোত বলে সেখানটিতেই শুয়ে পড়ে থাকতুম। একদিন পুকুর-জলে শরীর পানে চেয়ে দেখি শুধু হাড় সার হয়েছে, দেহেতে আর কিছু নেই। তখন ভাবলুম—আরে ছিঃ! এই দেহ তবে আর কেন? এইখানেই দেহটি থাক্, দেহ ছাড়ি। পরে নিবি (মা কি নাম বললেন ঠিক মনে নেই) এসে বললে, 'ওমা, তুমি এখানে পড়ে কেন?

চল, চল, ঘরে চল'—বলে ঘরে নিয়ে এল। এখন আর পুকুরধারে সে সব জায়গা নেই। ভাগ করে সব ঘিরে ঘুরে নিয়েছে।"

রাত্রি সাড়ে দশটা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বিদায় নিলুম।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ দর্শন করিতে গিয়ে সুবিধা থাকায় মার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল, সবই কিন্তু মঠের সন্ন্যাসী ছেলেদের কথা। প্রেমানন্দ স্বামিজীর দেহরক্ষায় বোধ হয় তাঁর মনে আজকাল ছেলেদের কথা সর্ব্বক্ষণ উদিত হচ্ছিল, তাই তাঁদের কথা তুলে মা বললেন, "ঠাকুরকে ছেলেরা সব বাঁড়ে (পরীক্ষা করে) নিয়ে তবে ছেড়েছে। বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল, তখন আহা! নিরঞ্জন-টন্ ওরা সব কতদিন আধপেটা খেয়ে ধ্যানজপ নিয়ে কাটিয়েছে। একদিন সকলে বলাবলি করলে, 'আচ্ছা, আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কিনা। সুরেশবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষেটিক্ষেও কেউ করতে যাব না।' এই বলে সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে দিলে। সারাদিন গেল—রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে

দরজায় কে ঘা মারছে। নরেন আগে উঠেছে, বলছে—'দেখ্ তো দরজা খুলে, কে? আগে দেখ্ তার হাতে কিছু আছে কি-না।' আহা! খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে (গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ী) ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেছে। দেখে তো সব মহা খুশি—ঠাকুরের দয়া টের পেলে। তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে। এমনি আরও কদিন হয়েছে। সিঁথির বেণী পালের বাড়ী হতেও অমনি করে একদিন লুচি এসেছিল। এখন ছেলেরা তো মহাসুখে আছে। আহা! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও আমার কতদিন ভাতের হাণ্ডা মাজতে হয়েছে। নরেন একবার গয়া-কাশীর দিকে যেতে যেতে দুদিন না খেয়ে এক গাছতলায় পড়েছিল। খানিক পরে দেখে কে তাকে ডাকছে। দেখে, একটি লোক খানকতক লুচি, তরকারি, মিষ্টি আর এক ঘটী ঠাণ্ডা জল সামনে ধরে বললে, 'রামজীর প্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন।' নরেন বললে, 'আমার সঙ্গে তো তোমার কোন পরিচয় নেই, তুমি ভুল করছ—আর কাউকে দিতে বলেছেন।' লোকটি মিনতি করে বললে, 'না, মহারাজজী, আপনার

জন্যেই এই সব এনেছি। দুপুরে আমি ঘুমিয়েছি, দেখি কি স্বপ্নে একজন বলছেন—শীগ্‌গির ওঠ্, অমুক গাছতলায় যে সাধু আছেন, তাঁকে খাবার দিয়ে আয়। স্বপ্ন ভেবে আমি তাতেও না উঠে পাশ ফিরে শুলুম। তখন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনি বললেন—আমি উঠতে বলছি, আর তুই ঘুমচ্ছিস, শীগ্‌গির যা। তখন মনে হল মিথ্যা স্বপ্ন নয়, রামজীই হুকুম করছেন। তাই এই সব নিয়ে ছুটে এসেছি।' তখন নরেন, ঠাকুরেরই দয়া ভেবে ঐ সব খাবার গ্রহণ করে।

"আর একবার এমনি হয়েছিল। তিন দিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে নরেনের ক্ষিদেয় মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা, এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির একটি কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাঁচে। নরেন আমেরিকা হতে ফিরে এসে এক সভায় (আলমোড়ায়) একদিন ঐ মুসলমানটিকে এক ধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধরে নিয়ে এসে সভার মাঝে বসালে। সকলে বললে, 'একি ?' তখন নরেন বললে, 'এ আমার জীবনদাতা।' —এই বলে ঘটনাটি সকলকে বললে। তাকে টাকাও দিয়েছিল। সে কিছুতেই নেবে না ; বলে, 'আমি কি করেছি যে টাকা দিচ্ছেন ?' নরেন তা' কি শোনে ?—বলে দিয়ে দিলে।

"আহা! নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা (দুর্গাপূজা) যেবার করায়—সেবার পূজককে * আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণে দেওয়ালে। চৌদ্দ শ টাকা খরচ করেছিল। পূজোর দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, 'ওমা, একি হল, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই, মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে ত খাটছে তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম আর কি। ইহা বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল!

"তাঁর মাকেও পূজোর সময় মঠে নিয়ে এসেছিল।

---

* সেবার কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ও শশী মহারাজের বাবা তন্ত্রধারক ছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজা করলেও তন্ত্রধারকই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ায় কার্য্যতঃ তিনিই পূজক ছিলেন। শ্রীশ্রীমা পূজক বলতে তাঁকেই লক্ষ্য করেছেন।

সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ বাগান, ও বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে, আমার নরেন এ সব করেছে। নরেন তখন তাকে এসে বলে, 'ওগো, তুমি করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বসনা—লঙ্কা ছিঁড়ে, বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এ সব করেছে। তা নয়, যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়।' মানে ঠাকুরই সব করেছেন। আহা! আমার বাবুরাম নেই, কে এবার পূজো করবে?"

২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, অমাবস্যা—১৩২৫

আজ গিয়ে দেখি, মা উত্তরের বারান্দায় বসে জপ করছেন। খানিক পরে পাঁচ-ছয়টি মেয়েলোক মাকে দেখতে এলেন। তাঁরা ঠাকুরপ্রণাম করে বসতেই মা জপ শেষ করে তাঁরা কোথা হতে আসছেন জিজ্ঞাসা করলেন। নলিনী তাদের পরিচয় দিলেন। শুনলাম, তাঁদের মধ্যে একজন চিকিৎসার জন্য এসেছেন, পেটে 'টিউমার' হয়েছে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন অস্ত্র করতে হবে, তাই শুনে তিনি বড় ভয় পেয়েছেন। কে জানে কেন, মা এদের কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। তাঁরা ঐজন্য বারবার প্রার্থনা করলেও স্বীকৃতা না হয়ে বললেন, "ঐ চৌকাঠ হতে ধূলো নাও।"

তাঁরা শেষে অসুস্থ মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ও সেরে উঠে আবার আপনার দর্শন পায়।" মা ভরসা দিয়ে বললেন, "ঠাকুরকে ভাল করে প্রণাম কর, উনিই সব।" পরে যেন একটু অতিষ্ঠভাবে বললেন, "তবে তোমরা এখন এস, রাত হল।" তারা ঠাকুরপ্রণাম করে চলে যাবার পরে বললেন, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল, ঠাকুরের ভোগ উঠবে।" বউ আদেশ পালন করলে মা উঠে এসে নীচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে আমার হাতে পাখা দিয়ে বললেন, "বাতাস কর তো মা, শরীর জ্বলে গেল। গড় (প্রণাম) করি মা কল্‌কাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলে মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ ত নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, 'ওরে, এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে, কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস্—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি।' ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস কর মা, আজ বেলা চারটা হতে লোক আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।

"আহা! আজ বলরামের পরিবারও এসেছিল, বাবুরামের জন্যে কত কাঁদলে। বললে, 'একি আমার যে-সে ভাই!' তাই ত মা, দেবতা ভাই।"

খানিক পরে তেল মালিশ করতে বললেন। মালিশ করতে করতে বললুম, "মা, ডাল রান্না করে এনেছি—ভক্তেরা খাবেন বলে।" মা বললেন, "বেশ করেছ, রাখালও দুটো ইলিস মাছ পাঠিয়েছে। বাবুরাম গিয়ে অবধি সে এখনও মাছ খায় নি।"

এর পূর্ব্বে একদিন রাধুর বর মাংস খেতে চেয়েছিল। সেই কথা এখন একজন বলায় মা বললেন, "এখন এখানে কেমন করে হবে? এই বাবুরামটি আমার চলে গেছে, সবারই মন খারাপ। এ ঠাকুরের সংসার, তাই কাজকর্ম্ম সব হচ্ছে। তা না হলে কান্নার রোলে বাড়ী ভরে যেতো, কেউ কি উঠতে পারতো! তবে খেতে চেয়েছে, দিতেই হবে। তা এরা যদি রান্না করে আনে, তবে হতে পারে।" ইহা বলে আমার পানে চাইতেই বললুম, "জামাই যদি আমাদের হাতে খান তবে অবশ্যই আনতে পারব।" মা বললেন, "তা খাবে না কেন? খুব খাবে। রান্না করে বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ছেলেদেরও কারু কারু অরুচি হয়েছে, জগদম্বার প্রসাদ হলে তারাও একটু একটু খাবে—তা কত হলে হবে, যোগীন?"

যোগীন-মা বললেন, "তা তিন-চার টাকার কমে হবে না।"

মা বললেন, "তবে কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো।"

আমি—তা হবে না মা, শোকহরণ রাগ করবে।

মা হাসতে লাগলেন, বললেন—"তবে থাক্।" পরের রবিবার কালীঘাট হতে মহাপ্রসাদ আনিয়ে রেঁধে পাঠানো হল।

২৭শে শ্রাবণ, সোমবার

আজ মায়ের কাছে যেতেই মা বললেন, "পাঁঠা বেশ হয়েছিল গো, সব্বাই বেশ খেয়েছে। কেমন করে রাঁধলে? আমি যখন ঠাকুরের জন্য রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখানা তেজপাতা ও অল্প মসলা দিতুম, তুলোর মত সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।"

আমি—সে বোধ হয় যুষ (সুরুয়া) হোত মা।

মা—তা হবে। নরেন আমার নানা রকমে মাংস রাঁধতে পারতো। চিরে চিরে ভাজতো, আলু চট্‌কে কি সব রাঁধতো—তাকে কি বলে?

আমি—বোধ হয় চপ্, কাট্‌লেট্ হবে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সে সব রাঁধতে পার?"

আমি—পারি। কাল জামায়ের জন্যে করে আনবো।

শোকহরণের বড় ইচ্ছা, আপনাকে কিছু খাবার তৈরী করে খাওয়ায়। তা আমি যদি রেঁধে আনি, খাবেন আপনি ?

মা—তা খাব না কেন মা, তুমি হলে আমার মেয়ে ; তবে বেশী করো না, অল্প স্বল্প। দেহ সুস্থ নয় কি-না, আর এই রাস্তাটা দিয়ে আনতে হবে।

আমি—আচ্ছা, তাই হবে।

ইহা বলে সেদিন বিদায় নিলুম।

পর দিন কিছু খাবার করে নিয়ে যেতেই মা বলছেন, "এই দেখ গো, আবার কত কষ্ট করে এ সব নিয়ে এসেছে।"

নলিনী বললেন, "তুমি চাও কেন, তাই তো নিয়ে আসে।"

মা বললেন, "তা, ওদের কাছে চাইব না—আমার মেয়ে ? আর এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা ! কি বল মা।"

আমি—সে তো ঠিক কথা। মা যে কৃপা করে আনতে বলেন, তাতেই আমরা ধন্য হয়ে যাই।

আজ অনেক রাত্রি হতে তবে গিয়েছিলুম। ভোগের পর প্রসাদ নিয়ে বাড়ী আসবার সময় বললুম, "কাল বোধ হয় আসা হবে না মা, এক বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে।"

"আচ্ছা, তা কাল না এলে ভাববো বিয়ে বাড়ী গেছ।"

ঘিটা সেদিন ভাল ছিল না; "ভাজা জিনিসগুলো তেমন ভাল হয় নি"—মা বলতে আর একদিন ভাল ঘিয়ে কয়েক রকম খাবার, পিঠে, ডাল ও তরকারি রেঁধে নিয়ে গিয়েছিলুম। খেয়ে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মার ভাইঝি নলিনীদিদির একটু শুচিবাই ছিল। তিনিও সেদিন ঐ সব খাবার খেয়ে বলেছিলেন, "আমার ত কারুর রান্না রোচে না, কিন্তু এর হাতে খেতে ত ঘেন্না হচ্চে না?" মা বললেন, "কেন হবে—ও যে আমার মেয়ে।" পরে আমাকে বলছেন, "দ্যাখ, সেদিন যে কচুশাকের অম্বল দিয়েছিলে, তা আমাকে ওরা দেয় নি।"

২৯শে শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ গিয়ে দেখি মা ডাক্তার দুর্গাপদ বাবুর ভগ্নীর সঙ্গে কথা কচ্চেন। বোর্ডিং-এর দুটি মেয়ে ও ঢাকা হতে একটি বউ এসেছেন। সকলে মাকে ঘিরে বসে আছেন। প্রণাম করে আমি বসলুম। ডাক্তার বাবুর ভগ্নী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর স্বামীর বিষয় নিয়ে গোল বেধেছে, ভাগ্নেরা গোল করছে, উইলের 'প্রবেট' পেতে দেরি হচ্ছে, এই সব অনেকক্ষণ কথা-

বার্ত্তা হল। শেষে মা বললেন, "দান-বিক্রয়ে যখন তোমার অধিকার নেই তখন ভাল লোকের হাতে বন্দোবস্তের ভার দিও। সংসারী বিষয়ী লোকদের কি বিশ্বাস আছে? টাকাকড়ির লোভ সামলে কাজ করতে পারে প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসীতে; তা মা, তুমি অত ভেবো না। যা করবার হরি করবেন। তুমি সৎপথে আছ; ঠাকুর কি আর তোমায় কষ্টে ফেলবেন? তবে এখন এস, (গাড়ী এসেছে, বাহির হতে তাগিদ আসছিল) চিঠি পত্র দিও, আবার এস।"

তিনি বিদায় নেবার পরেই শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ গোলাপ-মাকে দেখতে এলেন। তিনি যদি দেখা করতে আসেন ভেবে মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। পরে তিনি চলে গেছেন শুনে শয়ন করলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার তোমার কাজটি কর।" আমি তেল মালিশ করতে বসলুম।

তেল মাখতে মাখতে মা বললেন, "আহা, গিরিশ ঘোষের বোন আমাকে বড় ভালবাসত, বাড়ীতে যা রান্নাবান্না করত আমার জন্যে আগে রেখে নিয়ে আসত, কত রকম রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে নিয়ে এসে, বসে বসে আমাকে খাওয়াত। একদিন বলে কি, 'মা, দুখানা ইলিসমাছ ভাজা খাও না, তোমার আর দোষ কি?'

আমি বললুম, 'তা কি হয় মা?' তার ভালবাসা মুখ-দেখান ছিল না। বড় ঘরের বউ ছিল, টাকাপয়সা ছিল, সে সব পাঁচ জনে নিয়ে নষ্ট করলে। অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসল। তা ছাড়া এক বৎসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করেছিল। শেষে মরবার সময় আমার জন্যে একশ টাকা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকতে হাতে করে দিতে লজ্জা বোধ করেছিল—কি বলে মাত্র একশটি টাকা দেয়। দেহ রাখবার পরে, তার ভাই এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যায়। আহা! বোধনের দিন দুপুরে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। সেবার পূজোর পরেই আমাদের কাশী যাওয়া হবে বলে সেদিন জিনিসপত্র গুছাতে এঘর ওঘর করে একটু ব্যস্ত ছিলুম। যাবার সময় বললে, 'তবে আসি, মা।' আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললুম, 'হাঁ, যাও।' বলতেই থপ্ থপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে যেতেই মনে হল, 'বললুম কি? যাও বললুম?' এমন ত আমি কাউকে বলি নে। আহা! আর এল না।* কেনই বা অমন কথা মুখ দিয়ে বেরুল! কিছুক্ষণ অন্য মনে

---

* তিনি সেইদিন রাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। মা ঐ দিন বৈকালে মঠে পূজা দেখতে গিয়েছিলেন।

চুপ করে থাকবার পরে আমাকে বললেন, "কাল এলে না মা, কেমন লাল পদ্মগুলি পাঠিয়েছিল শোকহরণ। আমি নিজেই তা দিয়ে ঠাকুরপূজো করেছিলুম। কেমন ঠাকুর সাজিয়েছিলুম! তুমি এসে দেখবে বলে সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ রেখেছিলুম।"

*   *   *   *

আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি, মা শুয়ে আছেন ও রাধু তাঁর পাশে ভিন্ন পাটিতে শুয়ে গল্প বলবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে দেখেই মা বললেন, "একটি গল্প বলত, মা।" আমি মুশকিলে পড়ে গেলুম, মায়ের কাছে কি গল্প বলি! তারপর সেদিন মীরাবাঈ পড়ে গিয়েছিলুম সেই গল্প বললুম। মীরার "বিন্ প্রেমসে নহি মিলে নন্দলালা" এই দোঁহাটি বলতেই মা বললেন, "আহা, আহা! তাই ত প্রেমভক্তি না হলে হয় না।" রাধুর কিন্তু এ গল্পটা বড় মনঃপূত হল না, শেষে সরলা এসে দুয়ো-রাণী সুয়ো-রাণীর গল্প বলতে সে খুশি হল। সরলাকে মা খুব ভালবাসেন, তিনি এখন গোলাপ-মার সেবায় নিযুক্তা। সেজন্য একটু পরেই চলে গেলেন। রাধু বলছে, "আমার পা কামড়াচ্ছে।" তাই আমি খানিক টিপে দিতে লাগলুম। রাধুর কিন্তু আমার টেপা পছন্দ হল না, বললে, "খুব জোরে দাও।"

মা তাই শুনে বললেন, "ঠাকুর আমার গা টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—এমনি করে টেপো।" ঐ কথা বলে মা আমাকে বললেন, "দাও ত মা, তোমার হাত-খানা।" আমি এগিয়ে দিতেই আমার হাত টিপে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওকে এমনি করে টেপো।" আমি তেমনি করে খানিকক্ষণ টিপতেই রাধু ঘুমিয়ে পড়লো। মা বললেন, "এইবার আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, মশা কামড়াচ্ছে।" একটু চুপ করে মা আবার বললেন, "মঠের এবার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়েছে। আমার বাবুরাম, দেবব্রত, শচীন সবাই চলে গেল।" দেবব্রত মহারাজের শরীরত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহারাজ 'উদ্বোধনে'র বাড়ীতে ভূত দেখেছিলেন। সেই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললেন, "আস্তে—ওরা ভয় পাবে। ঠাকুরও অমন কত দেখতেন গো! একবার বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি—'তুমি কেন এখানে এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা! তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও।' তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন? তিনি ত হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়াদাওয়ার পরেই একখানা গাড়ী

ডেকে দিতে বললেন। কথা ছিল—রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বললে, 'এত রাতে গাড়ী পাব কোথায় ?' ঠাকুর বললেন, 'তা পাবে, যাও'। তারা ত গিয়ে গাড়ী আনলে। তিনি সেই রাতেই গাড়ী করে চলে এলেন। অত রাতে ফটকে গাড়ীর শব্দ পেয়ে কান পেতে শুনি—ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলছেন। শুনেই ভাবলুম—ওমা কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেবো এই রাতে ? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে রাখ্‌তুম—এই সুজি হোক, যাই হোক। কেন না, কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিক ত ছিল না। তা সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখি নি। মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব নাম করতে লাগলেন, কি করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন। আমি বলছি, 'ও যদুর মা (ঝি), কি হবে ?' তিনি শুনে বুঝতে পেরে তাঁর ঘর থেকেই ডেকে বলছেন, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।' পরে রাখালকে সেই ভূতের কথা বলতে সে বলছে—'ও বাবা, তখন বল নি ভালই করেছ, তা হলে আমার দাঁত কপাটি লেগে যেত ; শুনে আমার এখনি ভয় পাচ্ছে।'

এই বলে মায়ের এই হাসি।

আমি—মা, ভূতগুলো তো বড় বেকুব। ঠাকুরের

কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে তা নয়, চলে যেতে কেন বললে মা?

মা বললেন, "ওদের কি আর মুক্তির বাকী রইল, ঠাকুরের যখন দর্শন পেলে? নরেন একবার মাদ্রাজে ভূতের পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল।"

আমি মাকে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বললুম, "মা, একদিন স্বপ্নে দেখি কি যেন আমি স্বামীর সহিত কোথায় যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখি—পথের মাঝে কূলকিনারা দেখা যায় না, এমনি এক নদী। গাছতলা দিয়ে নদীর ধারে যাবার সময় আমার হাতে সোনালি রং-এর একটা লতা এমন জড়িয়ে গেল যে আর খুলতে পারছি না। সেটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে নদীর কাছে গিয়ে দেখি, ওপার হতে একটি কালো ছেলে একখানা পারের নৌকা নিয়ে এল। সে বললে, 'হাতের লতাটা সব কেটে ফেল, তবে পার করব।' আমি সেটার প্রায় সবটা কেটে ফেলেছি, একটু কিন্তু আর কিছুতে পারছি না, ইতোমধ্যে আমার স্বামী যেন কোথায় চলে গেলেন, তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। শেষে আমি বললুম, 'একটু আর কাটতে পারছি না। আমাকে কিন্তু পার করতেই হবে।' এই বলে নৌকায় উঠে পড়লুম। উঠবামাত্র নৌকা ছেড়ে দিলে, স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল।"

মা—ঐটি যে দেখলে ঐ ওঁর রূপ ধরে মহামায়া পার করে নিলেন। স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ মা, দেড় সের ছাই বই ত নয় —তার আবার গরব কিসের। যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল, জয় মা জগদম্বা, গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা, ব্রহ্মবারি। দুমাস আরা জেলায় কৈলোয়ার বলে এক দেশে ছিলুম—সেখানকার জল-বায়ু ভাল বলে। সঙ্গে গোলাপ, বাবুরামের মা, বলরামের পরিবার, এরা সব ছিল। সে দেশে কি হরিণ মা, সব দল বেঁধে তিন কোণা 'ব'-এর মত হয়ে চলেছে! দেখতে না দেখতে এমন ছুট দিলে, সে আর কি বলবো, যেন পাখা ধরে উড়ে যাচ্ছে! এমন দৌড় দেখি নি। আহা! ঠাকুর বলতেন, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটি আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে।' ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা, কি বল মা?

মায়ের গায়ের আমবাত বড় বেড়েছে। মা বলছেন, "তিন বছর হল মা, এই যে আমবাতে ধরেছে, মলুম এর জ্বালায়। জানি না মা, কার পাপ আশ্রয় করলে, নইলে এ সব দেহে কি রোগ হয়?"

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছি। দেখি নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এসেছে—ওখানে দুটি মাদ্রাজী মেয়ে আছেন, তাঁরাও এসেছেন আর মা তাঁদের পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁরা ইংরেজী জানেন শুনে মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আমরা এখন বাড়ী যাব—এর ইংরাজী কর ত।" তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন অন্তকে বলছেন, "তুমি কর।" তারপর ওঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি তিনিই করলেন। মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ী গিয়ে কি খাবে?—এর ইংরাজী কি হবে? উত্তর শুনে মা খুব খুশি, হাসতে লাগলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা গান জান?" তাঁরা "জানি" বলাতে মাদ্রাজী গান গাইতে মা আদেশ করলেন। মেয়ে দুটি মাদ্রাজী গান গাইলেন। মাও শুনতে শুনতে খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে আবার মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদিদি তাঁদের আশ্রমের দুটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন। তারা মাকে প্রণাম

করতেই মা আশীর্ব্বাদ করে একটি ছোট্ট মেয়েকে (বছর আট হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি গান গাইতে জান ?"

মেয়েটি বললে, "জানি।"

মা—গাও ত, শুনি।

মেয়েটি একটি গান গাইল। তার দুই-এক ছত্র মনে পড়ছে—

"জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদপল্লব দীন জনে,
কিঙ্করী গৌরী তনয়া তোমারি রেখো মনে।"

মেয়েটি গৌরীমার শিক্ষিতা, অবিকল গৌরীমার স্বরে গাইল। মা বিস্মিতা হয়ে বললেন, "তাই ত, ঠিক যেন গৌরদাসী! সে বেঁচে আছে, তা নইলে বলতুম—তার প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে!" মেয়েটিকে আদর করে চুমো খেয়ে আর একদিন এসে গান শুনাতে বললেন।

৫ই ভাদ্র, ১৩২৫

আজ সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। মা তাঁর তক্তাপোশের পাশে মেজেতে একটি মাদুরে শুয়ে আছেন। প্রণাম করে কথাপ্রসঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, অনেক দিন এসেছি, এখন কি আমার কালীঘাটের বাসায় যাওয়া উচিত ?"

মা— থাক না আরও কিছুদিন, সেখানে গেলে

এখানটিতে ত আর এমন করে আসতে পাবে না। একদিন যদি না আস ত ভাবি কেন এল না গো! এই কাল আস নি, ভাবলুম অসুখ করল না-কি, আজ না এলে বামুন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিতুম। তবে যদি তোমার স্বামীর কোন অসুখ-বিসুখ করে, আর তার মনের ভাবে বোঝ যে তার ইচ্ছা তুমি এখনি যাও, তা হলে অবিশ্যি যেতে হবে।

আমি—তিনি প্রসন্ন থাকলেও লোকে ত, মা, বলে ঘর-সংসার ছেড়ে এতদিন বোনের বাড়ী রয়েছে, স্বামীর সেবা, সংসার এ সবও ত করা কর্ত্তব্য।

মা—ঢের দিন ত সংসার করলে। লোকের কথা ছেড়ে দাও, তারা অমন বলে থাকে। পূজোর সময় আশ্বিন মাসে ত সেখানে যেতেই হবে।

আমি—সংসারের জন্য বড় একটা ভাবনা কখনো ছিল বলে ত মনে হয় না, মা! আপনার কাছে এমন আসতে পাব না, সেই ভাবনাই এখন সর্ব্বদা মনে হয়।

মা—তবে আর কি? থাক না এ মাসটা।

জনৈকা মহিলা মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একজন ব্রহ্মচারী খবর দিয়ে গেলেন। ইতঃপূর্ব্বে বিষম ক্লান্ত হয়ে মা শুয়ে ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে "এই আবার একজনকে নিয়ে আসছে। আঃ—গেলুম মা" বলে বিরক্তিপ্রকাশ করে উঠে বসলেন। খানিক

পরে সুন্দরবসন-ভূষণপরিহিতা একটি মহিলা মায়ের শয্যাপ্রান্তে এসে বসে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। মা তাতে বললেন, "ওখানেই কর না মা, পায়ে কেন?" তারপর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি বললেন, "জানেনই ত মা, তাঁর অসুখ।"

মা—হাঁ শুনেছি, তা এখন কেমন আছেন? কি অসুখ, কে দেখছেন?

তিনি— অসুখ বহুমূত্র; ডাক্তার দেখছেন। পেটে জল হয়েছে, পা একটু ফুলেছে, ডাক্তাররা বলছেন— খুব শক্ত ব্যারাম। তা ডাক্তারদের কথা আমি মানি নে। মা, আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি বলুন —তিনি ভাল হবেন।

মা—আমি কি জানি মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যদি ভাল করেন তবেই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব।

তিনি—তা হলেই হল। আপনার কথা কি ঠাকুর ঠেলতে পারেন?

এই বলে তিনি আবার শ্রীচরণে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।

মা তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "ঠাকুরকে ডাকো। তিনি যেন তোমার হাতের নোয়া রাখেন। এখন খাওয়া-দাওয়া কি করেন?"

তিনি—এখন লুচি এই সব খান।

এইরূপ দুই-চারি কথার পরে তিনি মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় নিলেন এবং নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

"সব লোকের জ্বালা-তাপে শরীর জ্বলে গেল মা।" এই বলে গায়ের কাপড় ফেলে মা শুলেন। আমি তেল মালিশ করবার উদ্যোগ করছি এমন সময় আবার মহিলাটির কে আত্মীয় (সঙ্গে এসেছেন) প্রণাম করতে এলেন। আবার মাকে উঠতে হল। তিনি চলে যেতে মা পুনরায় শুয়ে বললেন, "এবার যেই আসুক আমি আর উঠছি নে। পায়ের ব্যথায় বারবার উঠতে কত কষ্ট দেখছ ত, মা! তারপর আমবাতের জ্বালায় সারা পিঠটা এমন করছে! বেশ করে তেলটা ঘষে ঘষে দাও ত।" তেলমালিশ করবার সময় পূর্ব্বোক্ত মহিলাটির কথা উঠায় মা বললেন, "অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথা মুড় খুঁড়ে মানসিক করে যাবে—তা নয়, কি সব গন্ধটন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখেছ? অমন করে কি ঠাকুরদেবতার স্থানে আসতে হয়? এখানকার সবই কেমন এক রকম।"

কিছুক্ষণ পরে বৌ এসে আমায় বললে, "লক্ষ্মণ (চাকর) নিতে এসে বসে আছে গো।" মা সাড়া

পেয়ে বৌকে প্রসাদ দিতে বলে বললেন, "এই আমি মাথা তুলেছি, প্রণাম কর গো।" আমি প্রণাম করে রওনা হলুম।

৬ই ভাদ্র, ১৩২৫

সন্ধ্যার পর আজ মার কাছে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতেই শুনি মা বলছেন (জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের সম্বন্ধে কথা উঠেছে), "বৌয়ের উপর তার অতিরিক্ত শাসন। অত কি ভাল? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা! ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না? অমন করে সে যে বলে, যদি আত্মহত্যাই করলে বা কোন দিকে বেরিয়েই গেল—তখন কি হবে?"

আমাকে দেখে বলছেন, "একটু আলতা পরেছে, তা আর কি হয়েছে। আহা! ওরা ত স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি ত চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন কাছে যেতে পেয়েছি, যখন বলেন নি এমন কি দুমাস পর্য্যন্ত নবত থেকে নামিই নি। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি। তিনি বলতেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে

ভালবাসে।'* হৃদয়কে বলেছিলেন, 'দেখ্ ত তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভাল করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।' তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমায় তিনশ টাকা দিয়ে † তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন—যিনি নিজে টাকাকড়ি ছুঁতেই পারতেন না।

"ঠাকুর চলে যাবার পর আমার যখন এখানে (কলকাতায়) আসার কথা হল, তখন আমি কামারপুকুরে। ওখানকার অনেকেই বলতে লাগল, 'ওমা, সেই সব অল্প বয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে কি থাকবে!' আমি ত মনে জানি, এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, 'তা, যাবে বই কি, তারা সব শিষ্য।' আমি শুধু শুনি। পরে আমাদের গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা আছেন, তিনি (লাহাদের প্রসন্নময়ী) ভারি ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমতী বলে সকলে তাঁর কথা মানে, আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা

---

* ঠাকুর গোলাপ-মাকেও বলেছিলেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা সরস্বতী —জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

† তাবিজের জন্য ঠাকুর ৩০০৲ টাকাই দিয়েছিলেন, কিন্তু তাবিজ গড়াতে কম (২০০৲ টাকা) লেগেছিল। বাকী ১০০৲ টাকা শুনেছি শ্রীশ্রীমাকে নগদ দেওয়া হয়েছিল।

করলুম, 'তুমি কি বল?' তিনি বললেন, 'সে কি গো? তুমি অবিশ্যি যাবে। তারা শিষ্য, তোমার ছেলের মত। একি একটা কথা! যাবে বই কি।' তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিলে। তখন এলুম। আহা! ওরা আমার জন্যে—গুরুভক্তির জন্যে জয়রামবাটীর বেড়ালটাকেও পুষছে!

"মা দুঃখ করতেন, 'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না!' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন, 'শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না—আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।' তা যা বলে গেছেন তা ঠিক হয়েছে মা।"

কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হতে আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

* * * *

আজ বৈকালে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মায়ের কাছে যাবার সময় হল, কেমন করে যাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। শোকহরণের ওয়াটারপ্রুফটা (সে বুদ্ধিটা

শ্রীমানই দিয়েছিলেন) সারা গায়ে জড়িয়ে ত চললুম। বৃষ্টির ঝাপটা নাকে মুখে লেগে অস্থির করতে লাগল। তবু সে যে কি আনন্দে, কি টানে ছুটে চলেছি তা বলবার নয়! খিড়কি-দরজা দিয়ে গেলুম। সামনে দিয়ে গেলে স্বামিজীরা দেখতে পেয়ে কি ভাববেন, লজ্জা হল। মার কাছে যেতেই আমার বেশ দেখে, মায়ের এই হাসি! কিন্তু যখন প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর পায়ে ভিজে কাপড় লাগল (কারণ মাথার কাপড়টা ভিজে গিয়েছিল) তখন ব্যস্ত হয়ে মা বললেন, "এই যে ভিজে গেছ। শীগ্গির কাপড় ছাড়, এই রাধুর কাপড়খানা পর।"

আমি বললুম, "দেখুন, মা, গায়ে হাত দিয়ে, আর কোথাও ভেজেনি, কাপড় ছাড়তে হবে না।"

মা দেখে বললেন, "তাই বটে।"

মা একখণ্ড ফ্লানেলের কথা বলেছিলেন, তাও নিয়ে গিয়েছিলুম। পট্টি বাঁধবার সুবিধা হবে বলে দুদিকে নূতন কাপড় দিয়ে ফিতের মত করে দিয়েছি দেখে মা ভারি খুশি হলেন। কথায় কথায় জয়রামবাটীর কথা উঠল।

মা—একবার সেখানে কি দুর্ভিক্ষই লাগল।* কত লোক যে খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ী আসত।

* ১৮৭১, মায়ের বয়স তখন ১১ বছর।

আমাদের আগের বছরের ধান মরাইবাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন, বলতেন, 'বাড়ীর সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে। সে আমার তাই খাবে।' এক একদিন এমন হোত, এত লোক এসে পড়তো যে খিচুড়িতে কুলাত না। তখনি আবার চড়ান হোত। আর সেই গরম গরম খিঁচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শীগ্গির জুড়োবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম। আহা! খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি মেয়েলোক এসেছে, মাথায় রুখো চুল, চোখ উন্মাদের মত। এসেই গরুর ডাবায় কুঁড়ো ভিজান ছিল তাই খেতে আরম্ভ করলে। আমরা এত বলছি বাড়ীর ভিতরে খিচুড়ি আছে দিচ্ছি, তা আর তার ধৈর্য্য মানছে না। খিদের জ্বালা কি কম! দেহ ধরলেই খিদে তেষ্টা সব আছে। এবার বাড়ীতে অসুখের সময় একদিন মাঝরাতে আমার এমনি খিদে পেলো! সরলা টরলা সব ঘুমিয়েছে। আহা! ওরা এই খেটেখুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকবো? নিজেই শুয়ে শুয়ে চারদিকে হাতড়াতে লাগলুম। দেখি, চারিটি খুদভাজা একটা বাটিতে রয়েছে। আবার মাথার

বালিশের পাশে দুখানা বিস্কুটও পেলুম। তখন ভারি খুশি। তাই খেয়ে ত জল খেলুম—জল ঘটিতে সামনেই ছিল। খিদের জ্বালায় খুদভাজা যে খাচ্ছি তা জ্ঞান নেই।

এই বলে হাসতে লাগলেন।

তারপর মা বললেন, "সেই সময়ে রাঁচি থেকে একটি ভক্ত বড় বড় পেঁপে এনেছিল। পেঁপেটা আমি বড় ভালবাসি, মা। আমি টুক্ টুক্ করে তাকাচ্ছি—আহা! এই পেঁপে আমাকে ওরা একটু দেয় ত খাই। তা, ওরা দেবে কেন? তখন যে আমার খুব জ্বর। কোয়ালপাড়ায় কি অসুখই করেছিল, মা! বেহুঁশ—এই বিছানাতেই বাহ্যে, পেচ্ছাব সব। সে সময় সরলা ও বৌ আমার খুব করেছে। (ক্রন্দনের স্বরে) তাই ভাবছি মা, আবার ত তেমনি ভুগতে হবে। তা সেবারে কাঞ্জিলালের ওষুধে সেরে গেল। আহা! মা, কি হাতপায়ের জ্বালা। কাঞ্জিলালের ঠাণ্ডা মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে থাকতুম শরৎও সেবার গিয়েছিল।"

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা মা, জয়রামবাটী থেকে চিঠি লিখে কেন সেই স্ত্রী-ভক্তটির সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন?"

মা—ওর ভাব আলাদা। এ ভাবের (ঠাকুরের ভাবের) নয়।"

বিস্মিত হয়ে গেলুম। ঐ অসুখ-বিসুখে অত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দূরে থেকেও আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তাই চিন্তা।

আমি তার পরদিন ভাল দেখে পাকা পেঁপে ও আম নিয়ে গেছি। মা কি খুশি, আর আমাদের খুশি করবার জন্য তাঁর কি আনন্দপ্রকাশ করা!

মা বলছেন, "এই যে গো কাল যে পেঁপের গল্প হল ঠিক সেই রকম, বেশ আম।" তারপর এই আমটি শরৎকে দিও, এইটি গণেনকে, এইটি জামাইকে—এমনি করে কিছু ভাগ করা হল। ভারি গরম, মায়ের বড় ঘামাচি বেরিয়েছে।

মা বলছেন, "চন্দন মাখলে ঘামাচি কমতে পারে, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা লাগে।"

আমি—কাল পাউডার নিয়ে আসবো? মাখলে ঘামাচি কমবে।

মা—তা এনো গো, দেখি তোমাদের পাউডার-ই মেখে। এক ঘটি জল আনতে বলত মা, একবার বাইরে যাব।

বৌ বললে, "জল রেখেছি।"

মা রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে হাসতে হাসতে ডাকছেন, "ও মেয়ে, ও মেয়ে, একবার এদিকে এস,

শীগ্‌গির এস।” আমি কাছে যেতেই বলছেন, “দেখ, দেখ ঐ বেশ্যাবাড়ীর সামনে জানালার ধারে একটা লোক, একবার এ-জানালা একবার ও-জানালা করে মরছে— ঢুকতে পারছে না। দেখো, কি মোহ, কি প্রবৃত্তি! ভিতর থেকে ঐ গানের শব্দ আসছে, আর ও ঢুকতে পারছে না। আহা! মলো গো ছট্‌ফটিয়ে।” মা এমনি করে ঐ কথাগুলি বলছেন যে, হাসি আর চাপতে পারলুম না। তখন মাও হাসেন, আমিও হাসি। হাসতে হাসতে দুজনে ঘরে এলুম।

আমি—আহা! ভগবানের জন্যে যদি ঐরূপ ছট্‌-ফটানিটুকু হয়! তা হয় না, মা।

একটি মেয়ের কথা উঠল। মা বললেন, “কি মোহ হয়েছে মা, ওর স্বামীর জন্যে! খেয়ে শুয়ে সুস্থির নেই, খেতে খেতে উঠে গিয়ে দেখে আসে। দিনরাত ঘরে বন্দী করে নিয়ে বসে আছে। ওর জন্যে সে ত কোন জায়গায় বেরুতে পর্য্যন্ত পারে না। ছি! ছি!! আর শরীর কি হচ্ছে দেখ! একটা ছেলে টেলে হলে যদি ওর এই ভাব কমে।”

বৌ এসে বললে, “তোমায় নিতে এসেছে গো।” রাতও হয়েছিল অনেক, প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

পরদিন মা রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে জপ করছেন।

ঘরে তাঁকে দেখতে না পেয়ে বারান্দায় গিয়েছি। মা বলছেন, "কিগো এলে, বস।" জপ সারা হল, হরিনামের ঝুলিটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলেন। মার বাড়ীর সামনে তখন মাঠ ছিল, তার পশ্চিম ধারে খোলার ঘরে যে কতকগুলি দরিদ্র লোক ভাড়াটে ছিল এইবার তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "এই দেখ সারাদিন খেটে খুটে এসে এখন সব নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে গো— দীনার্ত্তরাই ধন্য!" যীশুখৃষ্টের মুখ দিয়ে একদিন ঐ কথা বেরিয়েছিল বাইবেলে পড়েছিলুম, মনে পড়লো। আজ মায়ের মুখেও সেই কথা শুনলুম! একটু পরে মা বললেন, "চল, ঘরে যাই।" বৌ নীচে বিছানা করে রেখেছিল, এসে শুলেন। সকালেই লক্ষ্মণকে দিয়ে পাউডার পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। মা বলছেন, "ওগো, তোমার দেওয়া পাউডার মেখেছিলুম, তাই ত এই দেখ, ঘামাচি-গুলো মিলিয়ে মজে এসেছে। এই খানটায় বড্ড হয়েছে, দাও। চুলকানিটাও যেন কমে গেছে। শরতেরও বড় ঘামাচি উঠেছে—আহা! তাকেও কেউ এইটি মাখিয়ে দেয়!"

আমি বললাম, "ও বাবা, তাঁকে এ কথা কে বলতে যাবে মা! ও জিনিসটা যে সৌখিন লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে।" শুনে মা হাসতে লাগলেন।

মায়ের হাঁটুর বাত বড় বেড়েছে। কাল জনৈক ভক্তের দুটি ছেলে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ব্যাটারী লাগিয়েছিল, তাতে একটু কমেছে। আজও সেই দুটি ছেলে এসেছে। ছোট মামী বলছেন, "আমারও কাল থেকে বাত বেড়েছে, আমিও ঐ কলটা লাগাবো গো!" মা শুনে হাসতে লাগলেন, বললেন—"দাও ত বাছা, ওকে।" ছেলে দুটি তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিয়ে যেই মামীর পায়ে একবার ব্যাটারী ধরেছে, আর সে কি চীৎকার—"ওগো, মলুম গো, সর্ব্ব শরীর ঝিন্‌ ঝিন্‌ করছে, ছাড় ছাড়!" শুনে সকলের হাসি। এ ত আর সর্ব্বংসহা জননী নন। তখন ছোট মামী মাকে বলছেন, "কই তুমি ত এমন হবে বললে নি?"

মা—সেরে যাবে, চেঁচাস নে, একটু সহ্য কর।

তারপর মামী বললেন, "সত্যিই, যেন একটু কমেছে।"

বিলাস মহারাজ আরতি করে গেলেন। বৌ বলছে, "আচ্ছা, এর নামে কোন 'আনন্দ' নেই?"

মা হেসে বলছেন, "আছে বই কি গো—ওর নাম বিশ্বেশ্বরানন্দ।" তারপর বলছেন, "একজনকে ডাকে কপিল। আচ্ছা, ওর সঙ্গে কি আনন্দ আছে? কপিলানন্দ নাকি?" (এই সময়ে সরলাদিদি ঘরে ঢুকলেন)।

মা—আচ্ছা, কপিল মানে কি?

স্যারদাদিদি বললেন, "কি জানি—বানর বোধ হয়।"

আমি—সে কি সরলাদিদি, কপি মানে বানর, কপিল মানে নয়। আর সকলের হাসি।

মা—আবার একজনের নাম আছে ভূমানন্দ। আচ্ছা, এর মানে কি?

আমি—সে ত আপনিই ভাল জানেন, মা।

মা—না, না, তোমরাই বল শুনি।

আমি—ভূমা মানে ত সেই অনন্ত বা সর্ব্বব্যাপী পুরুষকেই বুঝায় শুনেছি, মা।

মা ঐকথা শুনে খুশি হয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। সত্যই মা এক এক সময় এমন ভাব দেখান যেন ছেলে মানুষটি—কিছুই জানেন না। আবার অন্য সময়ে দেখেছি, কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেমন ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। যেখানে মানুষের পুঁথিগত বিদ্যায় কুলায় না, তখন আর এক ভাব, যেন সব বুঝেন। মা বললেন, "আর কপিল মানে কি হল?" মা ওটি শুনতেই চান।

আমি—কি জানি মা। কপিল নামে ত সাংখ্য-দর্শনপ্রণেতা এক মুনি ছিলেন, আবার কপিল রংও আছে। ওঁরা কি অর্থে নাম রেখেছেন কি জানি, ঐ কথার আরও হয় ত অর্থ আছে—মনে পড়ছে না। কাল অভিধান দেখে আসবো।

এই সময়ে একদিন বৈকালে গিয়েছি। একজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাকে প্রনাম করতে এসে বলছেন,—"মা, মাঝে মাঝে প্রাণে এত অশান্তি আসে কেন? কেন সর্ব্বক্ষণ আপনার চিন্তা নিয়ে থাকতে পারি না? পাঁচটা বাজে চিন্তা কেন এসে পড়ে? মা, ছোটখাটো অনেক জিনিস ত চাইলেই পাওয়া যায়, পেয়েও এসেছি, আপনাকে কি কোন দিনই পাব না? মা, কিসে শান্তি পাব বলে দিন—আপনার কৃপা কি কখনও পাব না? আজকাল দর্শন-টর্শনও বড় একটা হয় না। আপনাকেই যদি না পেলুম তবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? শরীরটা গেলেই ভাল।"

মা—সে কি বাছা, ও কথা কি ভাবতে আছে? দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ্ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল্-মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়লো, কোন দিন বা নাই পড়লো, তাই বলে বসা ছেড়ো না।' জপ বাড়িয়ে দাও।

যোগীন-মা—হ্যাঁ, নামব্রহ্ম। প্রথম প্রথম মন একাগ্র না হলেও হবে নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "কত সংখ্যা জপ করবো আপনি বলে দিন, মা, তবে যদি মনে একাগ্রতা আসে।"

মা—আচ্ছা, রোজ দশ হাজার করো, দশ হাজার—বিশ হাজার, যা পার।

সন্ন্যাসী—মা, একদিন সেখানে ঠাকুরঘরে পড়ে কাঁদছি, এমন সময় দেখলুম, আপনি মাথার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুই কি চাস?' আমি বললুম, 'মা, আমি আপনার কৃপা চাই, যেমন সুরথকে করেছিলেন।' আবার বললুম, 'না মা, সে ত দুর্গারূপে; আমি সেইরূপে চাই না, এইরূপে।' আপনি একটু হেসে চলে গেলেন। মন তখন আরও ব্যাকুল হল, কিছুই ভাল লাগে না; মনে হল, যখন তাঁকে লাভ করতে পারলুম না, তখন আর আছি কেন?

মা—কেন, ঐ যেটুকু পেয়েছ তাই ধরে থাক না কেন? মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন। ঠাকুর যে বলে গেছেন, এখানকার সককে তিনি শেষ দিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সন্ন্যাসী—যেখানে ছিলুম, তিনি খুব ভক্ত-গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রী এক বড় লোকের কন্যা, খুব খরচ করেন। মাছ খাবার জন্যে আমাকে বড় অনুরোধ করেন। আমি খাই না।

মা—মাছ খাবে। খাবার ভিতর আছে কি? মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাকে বেশী বাজে খরচ করতে বারণ করবে। ভক্ত গৃহস্থের টাকা থাকলে সাধুদের কত

উপকারে লাগে। তাদের টাকাতেই ত সাধুরা বর্ষাকালে একস্থানে বসে চাতুর্ম্মাস্য করতে পারে। তখন ত সাধুদের ভ্রমণ করে ভিক্ষা করবার সুবিধা হয় না।

সন্ন্যাসীটি প্রণাম করে নীচে গেলেন।

১৭ই ভাদ্র, ১৩২৫

আমার অসুখ করেছিল, একটু ভাল হতে আজ সন্ধ্যারতির পরে গেছি। মা তখন শুয়ে ছিলেন। দেখেই বললেন, "কি গো, ভাল আছ? অসুখ সেরেছে?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, মা।" মা সাংসারিক কুশল-প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। ঢাকার একটি শিষ্যা মাসখানেক হতে চললো 'উদ্বোধনে' আছেন, তিনি বললেন, "মা, তেল মালিশ করে দেবো? দিদির (আমার) তো শরীর ভাল নয়।"

মা—"তা হোক, ও দিতে পারবে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করবার পরও বললেন, "না, না, ও তেল দিতে পারবে। তুমি না হয় একটু বাতাস কর।" তিনি বাতাস করতে লাগলেন। একটু বাতাস করার পর মা বললেন, "হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগছে, এখন একটু শোওগে। জল খেয়েছ? মিষ্টি নিয়ে জল খাও না।" মা এমনি করে সকলের মনস্তুষ্টি করে থাকেন। তিনি উঠে মায়ের কথামত জল খেয়ে শুলেন।

মা—(আমাকে) কাল কেমন ঠাকুরের বই পড়া হল, সরলা পড়েছিল। কি সব কথা! তখন কি জানি মা, এত সব হবে! কি মানুষই এসেছিলেন! কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল! কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি, কথা, গল্প, কীর্ত্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে ত আমি কখন তাঁর অশান্তি দেখি নি। আমাকে এমন কত সব ভাল ভাল কথা বলতেন। আহা! যদি লেখাপড়া জানতুম, তা হলে অমনি করে সেই সব টুকে টুকে রাখতুম। কই গো সরলা, আজ আবার একটু পড় না।” তিনি ‘কথামৃত’ পড়তে লাগলেন। রাখাল মহারাজের বাবা এসেছেন, ঐখান থেকে পাঠ আরম্ভ হল। পড়া শুনতে শুনতে মা বলছেন, “ঐ যে রাখালের কথায় তার বাপকে বললেন, ‘যেমন ওল তেমন মুখীটি ত হবে।’ সত্যই তিনি অমনি করে রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন। তিনি এলেই যত্ন করে এটি ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা বলতেন—মনে ভয় পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎমা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, ‘ওরে, ওঁকে ভাল করে দেখা-শুনা, যত্ন কর, তা হলে জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে।’” পড়তে পড়তে বৃন্দে-ঝির লুচির কথা এল,

মা বললেন, "হ্যাঁ গো, সে কি কম ছিল? তার জল-খাবারের বরাদ্দের লুচি যদি কোন দিন খরচ হয়ে যেত, তবে বকে অনর্থ করতো; বলত। ওমা, কেমন সব ভদ্দর লোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে থাকে—মিষ্টিটাও পাই না।

"ঐ সব কথা পাছে ছেলেদের কানে যায়, তাই ঠাকুর আবার ভয় করতেন। একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে আমাকে বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি ত খরচ হয়ে গেছে, তা তুমি তাকে রুটি, লুচি যা হয় করে দিও, নইলে এক্ষণি এসে আবার বকাবকি করবে। দুর্জ্জনকে পরিহার করে চলতে হয়।'

"আমি ত বৃন্দে আসতেই তাড়াতাড়ি বললুম, 'বৃন্দে, তোমার খাবার তৈয়ের করে দি, খরচ হয়ে গেছে।' তখন সে বললে, 'থাক আর তৈয়ের করতে হবে না, এমনি দাও।' তখন যেমন সিধে সাজায়, তেমনি করে ঘি, ময়দা, আলু, পটল সব দিলুম।"

এক অধ্যায় পাঠ হলে সরলাদিদি গোলাপ-মার সেবায় গেলেন, তাঁর অসুখ।

মা আস্তে আস্তে বলছেন, "ঠাকুর ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, 'দেখ্‌ছ ত মানুষের দেহ কি!—এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে

এসে কত দুঃখ, কত জ্বালা পায়। এ দেহের আবার পয়দা করা কেন? এক ভগবানই নিত্য সত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভাল। দেহ ধরলেই নানা উপসর্গ।' সে দিন বিলাস এসে বলছে, 'কত সাবধানে আমাদের থাকতে হয় মা, পাছে মনেও কিছু উঠে এই ভয়েও সশঙ্ক থাকতে হয়।' তাই ত, ওর হল সাদা কাপড় আর সংসারীরা হল কাল কাপড়। কাল কাপড়ে কালী পড়লেও অত ঠাওর হয় না, কিন্তু সাদা কাপড়ে এক বিন্দু পড়লেই সকলের চোখ পড়ে। দেহ ধরলেই বিপদ। সংসার ত এই কাম-কাঞ্চন নিয়েই আছে। ওদের (সাধুদের) কত ত্যাগ করে চলতে হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, 'সাধু সাবধান'।"

ইতোমধ্যে হরিহর মহারাজ ঠাকুরের ভোগ দিতে এসেছেন। তাঁকে দেখিয়ে মা বলছেন, "এই দেখ একটি ত্যাগী ছেলে, ঠাকুরের নাম নিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। সংসারী লোক খালি গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলের জন্ম দিতে থাকে, ঐ যেন কাজ। ঠাকুর বলতেন, 'দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযমে থাকতে।' ইংরাজেরা নাকি বিষয় বুঝে ছেলের জন্ম দেয়—যে এই (সম্পত্তি) আছে, এতে একটি ছেলে হলে বেশ চলবে এবং তাই হবার পর স্ত্রী-পুরুষ, দুজনে বেশ আলাদা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকে। আর আমাদের জাতের?"

মা হাসতে হাসতে বলছেন, "কাল একটি বৌ এসেছিল, মা। গ্যাঁড়া গোঁড়া ছোট্টটি, তার কোলে পিঠে ছেলে, ভাল করে সামলে নিতেও পারছে না। তারপর বলে কি, 'মা, সংসার ভাল লাগে না।' আমি বলি, 'সে কি গো, তোমার এই সব কাচ্চা-বাচ্চা।' তাতে বললে, 'ঐ পর্য্যন্তই, আর হবে না।' বললুম, তা পার যদি ভালই ত গো।" এই বলে হাসতে লাগলেন।

আমি—আচ্ছা মা, সংসারে ত স্ত্রীলোকদের স্বামী একান্ত পূজ্য ও গুরু। তাঁর সেবায় সালোক্য, সাযুজ্য পর্য্যন্ত মিলে থাকে—শাস্ত্রে বলে। সেই স্বামীর কতকটা মতের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রী যদি অনুনয়-বিনয় বা সদালাপ দ্বারা সংযমী হয়ে থাকতে চেষ্টা করে তাতে কি পাপ হয়?

মা—ভগবানের জন্য হলে কোন পাপ হয় না মা। কেন হবে? ইন্দ্রিয়সংযম চাই, এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা সব ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যে।

ঠাকুরের কোন বিষয়ই ভগবান ছাড়া ছিল না। আমাকে যে-সব জিনিস দিয়ে ষোড়শীপূজা করেছিলেন, সেই সব শাঁখা সাড়ী ইত্যাদি—আমার ত গুরু-মা ছিলেন না—কি করবো ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভেবে বললেন, 'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পার'—

তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—'কিন্তু দেখো তাঁকে যেন মানুষ-জ্ঞান করে দিও না, সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেধে দেবে।' তাই করলুম ; এমনি শিক্ষা তাঁর ছিল।

শোকহরণ মাসিক যে পাঁচ টাকা দেয়, তা মাকে দিতে দিয়েছিল। দিতেই মা বললেন, "কেন মা, এখন তার কষ্ট, এখন নাই বা দিলে।"

আমি—কত দিকে কত খরচ হয়ে যাচ্ছে, মা, এ ত আর বেশী নয়। যে আপনার সেবায় দিতে পারে তারই মনের তৃপ্তি, নইলে—

মা বললেন, "হাঁ, তা বটে। এখানে দিলে সাধু-ভক্তের সেবায় লাগে।"

মালপো এনেছিলুম, খুলে ঠাকুরের কাছে দিতে বললেন। রাত অনেক হয়েছিল, প্রায় সাড়ে দশটা—ভোগ হয়ে গেছে, মায়ের আহারের পর প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলুম।

১৮ই ভাদ্র, ১৩২৫

মা জপের আসনে বসে আছেন। আরতি হয়ে গেছে। রাধুর স্বামীর জন্য মাংস রেঁধে এনেছিলুম, রাধুকে ডেকে তেতলায় তার ঘরে রেখে আসতে বললেন। আমি রেখে এসে প্রণাম করে বসলুম। মা কুশলাদি জিজ্ঞাসা

করলেন। একটি আত্মীয়া মেয়ে এসে মাকে বলছেন, "তুমি আমার মনটি ভাল করে দাও, আমার মনে বড় অশান্তি, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই, যা আছে তোমাকে লিখে পড়ে দিয়ে যাব। আমি মরবার পরে তুমি সেই মত কাজ কোরো।"

মা হেসে বললেন, "তা কবে মরবি গো!" শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা হলে আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও, এ সব জায়গায় যেন একটা বিপদ করে বসো না। এমন জায়গায় থেকে, আর আমার কাছে থে— (থে পর্য্যন্ত বলেই সামলে নিয়ে বললেন) এই সব সাধু-ভক্ত, ঠাকুর, এমন স্থানে থেকেও যদি তোর মনের অশান্তি না ঘোচে, তবে তুই কি চাস্ বল্ দেখি? * * * কি জীবন তুই পেয়েছিস বল্ দেখি? কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। এ জন্মটা যে কিনে নিয়ে যেতে পারতিস্। এ স্থান যখন চিনলি নি—চিনবি একদিন যখন অভাব হবে, তবে এখন বুঝলি নি। তোর পাপ মন, তাই শান্তি পাস্ নে। কাজকর্ম্ম না করে বসে থেকে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। একটা ভাল চিন্তা কি তোর কিছু করতে নেই? কি অশুদ্ধ মন গো!" এই বলেই আবার হেসে উঠে আমার পানে তাকিয়ে বলছেন, "কি ঠাকুরের লীলা মা দেখছ! মায়ের বংশটি আমার কেমন দিয়েছেন! কি কুসংসর্গই

করছি দেখ! এইটি ত পাগলই, আর একটিও পাগল হবার গতিক হয়েছে। আর ঐ দেখ আর একটি, কাকেই বা মানুষ করেছিলুম মা, একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কখন স্বামী ফিরবে। মনে ভয়, ঐ যে গানবাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐখানেই ঢুকে পড়ে। দিনরাত সামলে নিয়ে আছে, কি আসক্তি মা! ওর যে এত আসক্তি হবে তা জানতুম না।"

আত্মীয়াটি বিষণ্নমুখে উঠে গিয়ে শুলেন।

মা—কত সৌভাগ্যে মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্ম্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলবো মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁশ থাকতো না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে* বসে জপ করছি, চার দিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারি নি—অন্যদিন জুতোর শব্দের টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্য রকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে সাড়ী। গা

---

* শ্রীশ্রীমা নহবতে নীচের কুঠরিতে থাকতেন। উহার পশ্চিমের বারান্দায় সিঁড়ির পাশে গঙ্গার দিকে দক্ষিণমুখ হয়ে তিনি ধ্যান করতেন।

থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন সে দিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সে সব কি দিনই গিয়েছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, 'তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও।' জপধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুনি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে! আহা! তখন কি মনই ছিল আমার! বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি গড়িয়ে (ঠেলা মেরে) দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল (মা নবতে ধ্যানস্থা ছিলেন, তাই শব্দটা যেন বজ্রের মত লেগেছিল—কেঁদে ফেলেছিলেন)। সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি, ডোমের মাঝেও তিনি—তবে ত মনে দীন ভাব আসবে। ওর (পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ার) কথা কি বলবো মা, জয়রামবাটীতে ডোমেরা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে, ঘরে দিতে এসেছে। আমি বললুম, 'ঐখানকে রাখ,' তা তারা কত সাবধান হয়ে রেখে গেল। ও বলে কি-না 'ঐ ছোঁয়া গেল, ও সব ফেলে দাও' এই বলে তাদের গালাগাল—'তোরা ডোম হয়ে

কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস্?' তারা তো ভয়ে মরে। আমি তখন বলি, 'তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নেই।' আবার তাদের মুড়ি খেতে পয়সা দি—এমন মন ওর! রাত তিনটের সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের) বারান্দায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তাতো করবে না, কেবল অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর? আমি ত মা তখন অশান্তি কেমন জানতুম না। এখন ঐ ওদের জন্যে, আর কিক্ষণে ছোট বৌ ঘরে এল, আর তার মেয়েকে মানুষ করতে গেলুম, সেই হতে যত জ্বালা। যাক্ সব চলে যাক্, কাউকে আমি চাই নে। এ কি মেয়ে সব হল গা! একটা কথা শোনে না। মেয়েলোক এত অবাধ্য?

গোলাপ-মা—আবার কেমন করে সাজে দেখ না, ভাবে—তবেই বুঝি বর ভালবাসবে।

মা—আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার* রাখতে গেছি, লক্ষ্মী

* সেদিন সরুচাকলি পিঠে আর সুজির পায়েস করে অন্য লোক নেই দেখে শ্রীশ্রীমা নিজেই সন্ধ্যার পর ঐ সব ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্'। আমি বললুম, 'আচ্ছা।' আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কে, তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী; কিছু মনে করো নি।' আমি বললুম, 'তা বললেই বা।' কখনো আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেন নি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন। তিনি বলতেন, 'কর্ম্ম করতে হয়; মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।' একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখবো, লুচি রাখবো ছেলেদের জন্যে।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম। চটের উপর পট্‌পটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হোত এখন এই সবে (খাট বিছানা দেখিয়ে) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাৎ বোধ হয় না, মা। তিনি বলতেন, 'ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে, কে জানে—এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দে করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে। তা, ও কিন্তু এমন যে কখন কি করে কেউ টেরই পায় না,

বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' তাঁর ঐ কথা শুনে আমার এমন ভাবনা হল যে কি বলব। ভাবলুম—ওমা, উনি ত যা চান তাই 'মা' ওঁকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাইরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি। ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলুম, 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর!' তা আমার এমনি মা-টি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন! এত বছর ছিলুম, একদিনও কারও সামনে পড়ি নি। লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তাই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে! এই গোলাপ, যোগীন এরা তার অনেক কথা জানে। আমি যদি ভাবি—এইটি হোক, কি এইটি খাব, তা ভগবান কোথা হতে সব জুটিয়ে এনে দেন। আহা! দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই গেছে মা। ঠাকুর কীর্ত্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে* চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় করে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে। আহা! বিষ্ণু বলে একটি ছেলে সংসারের ভয়ে আত্মহত্যাই করলে। তা ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ও যে

* নহবতের বারান্দায় দরমার বেড়া দেওয়া ছিল।

আত্মহত্যা করলে, ওর পাপ হল না?' তিনি বললেন, 'ও ভগবানের জন্যে দেহ দিয়েছে, ওর আবার পাপ কি? কোন পাপ নেই, তবে এ কথাটি সবাইকে বলো না। সবাই ভাবটি বুঝবে না—তা দেখ এখন বইয়েই ছাপিয়ে দিয়েছে।'

"মন না মত্ত হস্তী, মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে। তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হোত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত। আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল। আর এই বাড়ীটি যে হল, এই চার কাঠা জমি কেদার দাস দিয়েছিল। এখন জমির দাম কত! এখন কি আর হয়ে উঠত? কে জানে সব ঠাকুরের ইচ্ছা।"

এমন সময়ে মাকু ছেলে কোলে করে এসে তাকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "কি করব মা, ঘুম নেই।"

মা বললেন, "ও সত্ত্বগুণী ছেলে, তাই ঘুম নেই।"

আমবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মা বললেন, "আঃ,

আমবাতের জ্বালায় গেলুম মা, মুখেও আবার বেড়িয়েছে। এই দেখ মুখে হাত বুলিয়ে। একি যাবে না? এই দেখ পেটেও উঠেছে, দাও তো পেটে ঐ তেলটি দিয়ে। ঐটি আমার প্রাণ গো, দিলেই একটু কমে।"

তেলমালিশ করতে করতে বললুম, "মা, বাড়ীতে একদিন ঠাকুরপূজো করে সংসারের কাজ করতে গেছি, কিছু পরে ঠাকুরঘরে এসে দেখি—ঠাকুরের ছবি বিন্দু বিন্দু ঘেমেছে। জানালা খোলা ছিল, ছবিতে রোদ লাগছিল। কিন্তু আমি ভাবলুম পূজো করবার সময় হয় ত জল লেগেছিল। বেশ করে মুছে রেখে গেলুম। রোদে ঘেমেছে কি-না বুঝবার জন্য কিছু পরে আবার এলুম। এবারও এসে দেখি ঠাকুর ঘেমে রয়েছেন। তখন জানালা বন্ধ করে দিলুম।"

মা—হ্যাঁ মা, তা অমন দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, 'ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।'

মা এইবার একটু চুপ করে রইলেন। বাসা হতে নিতে লক্ষ্মণ এসেছিল। মা বললেন, "তবে এস মা, এস।" প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে বাসায় ফিরলুম।

একদিন মা উত্তরের বাসান্দায় বসে আছেন, জনৈক গৃহস্থ যুবক-ভক্ত মায়ের সঙ্গে কি কথা বলছেন। তিনি মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলছেন, "মা, আমি সংসারে

অনেক দাগা পেয়েছি, তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আমি আছি।"

মা স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।"

তিনি—হ্যাঁ মা, কিন্তু এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখন মনে না আসে যে তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।

২রা আশ্বিন, ১৩২৫

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মায়ের তক্তাপোশের পাশে নীচে মাদুর পাতা হয়েছে। মা শোবার উদ্যোগ করছেন। আমি যেতেই বললেন, "এস, এস, আমার কাছে এসে বস। একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাও ত সরলা, সারা দিন খেটে আবার এই ছুটে আসছে।" আমি জল খেতে আপত্তি করলুম, কিন্তু তা কানেও তুললেন না; বললেন, "দেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয় মা; সুমতি তিন ছেলের মা হয়েই যেন বুড়ী হয়ে গেছে।" মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বললেন, "এ কি হল মা, লোকের হয়, যায়; আমার যেটি হবে সেটি আর

ছাড়তে চায় না। ঠাকুর যে বলতেন, 'যত লোকে রোগ, শোক, পাপ, তাপ নিয়ে কত কি করে এসে ছোঁয়, সেই সব এই দেহে আশ্রয় করে, তা ঠিক মা—আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজো দেবে বলে জিনিসপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখেছ, কি অন্যায় করলে? জগদম্বার জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে *।' আমি ত ভয়ে মরি, ভাবি—এই ত অসুখ, কি জানি কি হবে। একি বাপু, কেন ওরা এমন করলে! ঠাকুর তখন বারবার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, 'দেখ, এর পর ঘর ঘর আমার পূজো হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা করো না।' সেই দিনই 'আমার' বলতে শুনলুম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন, 'এই খোলটার' বা আপনার শরীর দেখিয়ে 'এই এর'। সংসারে কত রকমের লোক সব দেখলুম।

---

* কাশীপুরে এই ঘটনা হয়েছিল। কয়েকটি ভক্ত মা কালীর জন্য একদিন অনেক রকম মিষ্টি খাবারদাবার এনে হল-ঘরে ঠাকুরের ছবির সামনে ভোগ দিয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্য* আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর (দক্ষিণেশ্বরের) দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে †। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষ-বুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নরেনও কত বলেছিল, 'মায়ের ও-টাকাটা বন্ধ কোরো না।' তবু করলে। তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল, গেল। দীনু ফীনু সব কে কোথায় গেছে। আমার ত এ পর্য্যন্ত কোন কষ্টই হয় নি। কেনই বা হবে? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

"ঠাকুরের দেহ রাখার পর তাঁর সব ভাল জিনিস-পত্র—বনাত, আলোয়ান, জামা কারা নেবে এই কথা নিয়ে গোল বাধে। তা ওসব হল ভক্তদের ধন, তারা ওসব চিরকাল যত্ন করে রাখ্‌বে। তারাই শেষে ঐ সব গুছিয়ে নিয়ে বাক্সে পুরে বলরামের বৈঠকখানায় এনে রাখলে। কিন্তু মা, ঠাকুরের কি ইচ্ছা—সেখান থেকে চাকরদের কে

---

* ত্রৈলোক্য বিশ্বাস রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবুর পুত্র। ঠাকুর যখন আর পূজা করতে পারলেন না তখন হতে তাঁর মাইনের টাকাটা বন্ধ না করে শ্রীশ্রীমাকে দিতেন।

† মা তখন বৃন্দাবনে। চিঠি যেতে মা বলেছিলেন, "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কি করবো।"

চাবি দিয়ে খুলে তার অনেকগুলি চুরি করে নিয়ে বিক্রী করে ফেললে—কি কি করলে। তা ওসব কি বৈঠক-খানায় রাখতে হয়? বাড়ীর ভিতরে নিয়ে রাখলেই পারতো। তাঁর ব্যবহারের জিনিসপত্র আর জামা কাপড় যা বাকী ছিল, তা এখন বেলুড় মঠে আছে।

"আমার যে শ্বশুর ছিলেন মা, বড় তেজস্বী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি অপরিগ্রাহী ছিলেন। কেহ কোন জিনিস বাড়ীতে দিতে এলেও নেবার নিষেধ ছিল। আমার শাশুড়ীর কাছে কিন্তু কেউ কিছু লুকিয়ে এনে দিলে তিনি রেঁধেবেড়ে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ দিতেন। শ্বশুর তা জানতে পারলে খুব রাগ করতেন। কিন্তু জলন্ত ভক্তি ছিল তাঁর। মা শীতলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। শেষ রাত্রে উঠে ফুল তুলতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একদিন লাহাদের বাগানে গিয়েছেন, একটি নবছরের মত মেয়ে এসে তাঁকে বলছে, 'বাবা, এদিকে এস। এদিকের ডালে খুব ফুল আছে। আচ্ছা, নুয়ে ধরছি, তুমি তোল।' তিনি বললেন, 'এ সময়ে এখানে তুমি কে মা?' 'আমি গো, আমি এই হালদার বাড়ীর।' অমন ছিলেন বলেই ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্মেছিলেন, তিনি এসেছিলেন আর তাঁর এই সব সাঙ্গোপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন, রাখাল, বলরাম,

ভবনাথ, মনোমোহন—কত বলব মা। ছোট নরেন শেষে বড় কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে পড়লো, টাকা-পয়সায় জড়িয়ে পড়লো। ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

"কামারপুকুরের হরিদাসী বলে একটি মেয়ে নবদ্বীপ যাবে বলে এসে ওখানেই রয়ে গেল। আমাকে কত ভালবাসত। তার কি বিশ্বাস ছিল মা! ঠাকুরের জন্মস্থানের ধূলো কুড়িয়ে রেখেছিল, বলতো—'এই ত নবদ্বীপ, স্বয়ং গৌরাঙ্গ এইখানেই এসেছিলেন। আবার কি করতে নবদ্বীপ যাব?' আহা কি বিশ্বাস! ঠাকুরের দেহ রাখবার পর একজন উড়ে সাধু এসে কামারপুকুরে ছিলেন। আমি তাঁর চাল ডাল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সব দিতুম, আর সকালে বিকালে খবর নিতুম, 'সাধু বাবা, কেমন আছ গো।'

"আহা! তাঁর একখানি কুঁড়ে কি করেই যে বেঁধেছিলুম, মা! রোজ আকাশ ভরে মেঘ হোত, এই বৃষ্টি হয়—হয় আর কি। তখন হাতজোড় করে বলতুম, 'ঠাকুর, রাখ গো, রাখ; ওঁর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক, তারপর যত পার ঢেলো।' তা গ্রামের লোকেও কাঠকুটো যা লাগল দিয়ে সাহায্য করলে। রোজ বৃষ্টি আসব আসব করতো। যা হোক এমনি করে কুঁড়েখানি ত হয়ে

গেল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই সাধুটি সেই কুঁড়েতে দেহ রাখলেন।”

মা বলছেন, “চল, এখন ঘরে যাই।” উঠতে উঠতে বললেন, “ঠাকুর বলতেন, ‘এই দেহটি গয়া হতে এসেছে।’ তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে বললেন, ‘তুমি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস।’ আমি বললুম, ‘পুত্র বর্তমান; আমি দেব, সেকি হয়?’ ঠাকুর বললেন, ‘তা হবে গো, আমার কি ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো?’ আমি বললুম, ‘তবে গিয়ে কাজ নেই।’ পরে গয়া করতে আমিই গিয়েছিলুম *।” রাত প্রায় সাড়ে নয়টা হয়েছে। প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

৩রা আশ্বিন, ১৩২৫

আজও মার ওখানে গিয়েছি। মা দেখেই বলছেন, “এসেছ মা, এস।” নবাসনের বৌকে বললেন, “তেলটি এনেছ? দাও তো, বৌমা, পিঠে মালিশ করে।” বৌ আমাকে দিতে বলায় মা বললেন, “আহা! ও এই

---

* ঠাকুরের দেহ-রক্ষার পর শ্রীশ্রীমা প্রথমবার বৃন্দাবন হতে ফিরে কামারপুকুর গিয়েছিলেন। বছর খানেক সেখানে থেকে পরে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে রাজু গোমস্তার ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন। তার পর গয়া যাবার জন্যে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী এসে তথা হতে স্বামী অদ্বৈতানন্দের (বুড়ো গোপাল) সঙ্গে গয়া যান।

সারাদিন খেটেখুটে ছুটে আসছে, একে একটু বিশ্রাম করতে দাও। (আমাকে) বস মা, বস। এই ওরা ভাস্করানন্দের কথা বলছিল। আমিও কাশীতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে অনেক মেয়েরা ছিল। তখন মন খুব খারাপ, ঠাকুরের দেহ রাখার পর। সেই বারই বৃন্দাবনে প্রথম গিয়েছিলুম। তা ভাস্করানন্দের ওখানে যখন গেলুম, দেখি নির্ব্বিকার মহাপুরুষ উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন। আমরা যেতেই মেয়েদের সব বললেন, 'শঙ্কা মৎ কর মায়ী, তোম্‌রা সব জগদম্বা, সরম কেয়া? এই ইন্দ্রিয়টি? এর জন্য? এ ত হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যেমন তেমন একটি।' আহা, কি নির্ব্বিকার মহাপুরুষ। শীত-গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন।"

তেলমালিশ শেষ হবার পর মা বললেন, "চল, এখন ঠাকুরের বই একটু পড়বে। সরলাটি বোর্ডিংএ চলে গেছে মা, অন্য দিন সে পড়তো।" পড়তে পড়তে সাধনের কথা, দর্শনাদির কথা উঠল।

মা—এই গোলাপ, যোগীন, এরা কত ধ্যানজপ করেছে। এসব আলোচনা করা ভাল। পরস্পরেরটা শুনে ওদেরও (ঢাকার বৌ, নবাসনের বৌ প্রভৃতি ছিল) এতে মতি হবে।"

দর্শনের কথা উঠলে, মা অনেক কথা চেপে গেলেন, সকলের সামনে সে সব বলবেন না বলে বোধ হয়।

নলিনী—পিসীমা, লোকের কত ধ্যানজপ হয়, দর্শন-স্পর্শন হয় শুনি, আমার কিছু হয় না কেন? তোমার সঙ্গে এত দিন যে রইলুম, কই আমার কি হল?

মা—ওদের হবে না কেন? খুব হবে। ওদের কত ভক্তি বিশ্বাস! বিশ্বাস ভক্তি চাই, তবে হয়। তোদের কি তা আছে?

নলিনী—আচ্ছা পিসীমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্য্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্য্যামী? আচ্ছা, আমার মনে কি আছে তুমি বলতে পার?

মা একটু হাসলেন। নলিনী আবার শক্ত করে ধরলেন। তখন মা বললেন, "ওরা বলে ভক্তিতে।" তার পর বললেন, "আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—(হাতজোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন) আমার 'আমিত্ব' যেন না আসে।"

মার ভাব দেখে হাসি এল, ধরাছোঁয়া না দেওয়ার ভান, আর আমরা ত এক একটি অহঙ্কারে ভরা। এ শিক্ষার মর্ম্ম বুঝবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়?

ঢাকার বৌ বলছেন, "আমার ছেলে বলে—মার কাছে আর কি বলব, মা ত জগদম্বা, অন্তরের কথা সব জানেন।"

আমি বললুম, "অনেকেই ত মাকে জগদম্বা বলেন,

কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন। অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্থ করা কথার মত শুনায়।"

মা হেসে বললেন, "তা ঠিক, মা।"

আমি—মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী, একথা মা যদি নিজে দয়া করে বুঝিয়ে না দেন, তা হলে আমাদের সাধ্য কি বুঝি! তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এখানেই যে, মায়ের ভিতরে আদৌ 'অহংকার' নেই। জীবমাত্রেই অহংএ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহংকারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!

মা প্রসন্নমুখে একবার আমার দিকে চাইলেন মাত্র। মনে মনে বললুম, "মা, দয়া কর মা, মুখে বলতে আমার লজ্জা করে, মনে যেন বলতে পারি।"

যাবার সময় হয়ে এসেছে। মা উঠে প্রসাদ হাতে দিয়ে বললেন, "প্রসাদে ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই, (আমার বুকে হাত দিয়ে) মনে এটি স্থির বিশ্বাস রেখো।" আজ বিশেষ করে কেন এটি বললেন? আজ তিন মাস হল, প্রায় রোজই আসি, যাই। যাবার সময় মা রোজই হাতভরে প্রসাদ দেন। অনেককে

দেওয়ার জন্য কোন কোন দিন প্রসাদের অভাব হতেও দেখেছি। মা তাই নিজের তক্তাপোশের নীচে একটি সরায় করে প্রসাদ রেখে দিতেন এবং বলে রাখতেন, "ওরটি রেখে আর সবাইকে দিও গো।" তাতেও আমার লজ্জা করতো। এই লজ্জা ভেঙ্গে দেবার জন্যই কি আজ বিশেষ করে ও কথাটি বললেন?

১১ই আশ্বিন, শনিবার (নবম্যাদিকল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন)—১৩২৫

প্রাতে গিয়েছি। মা ফল কাটছিলেন, দেখেই বললেন, "এসেছ মা, এস। আজ বোধন (আমার এই কথা মনেই ছিল না)। ঠাকুরের এই ফুলগুলি বেছে সাজিয়ে রাখ, ফলের থালা এই পাশটিতে রেখে দাও।" আদেশ পালন করলুম। ফল ইত্যাদি কাটা হয়ে গেলে মা পাশের ঘরে এলেন। স্নান করবেন। তেলের ভাঁড়, চিরুণি নিয়ে আমার কোলের কাছে এসে বসলেন। মাথায় হাত দিতে আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে মা বললেন, "দাও না গো মাথাটা আঁচড়ে।"—যেন বালিকাটি! আদেশ পেয়ে আমি আঁচড়ে দিচ্ছি। রাধু নেয়ে এসে বলছে, "চিড়ে দিয়ে দই দিয়ে খাবো।"

মা সেখানেই একটি বাটিতে চিড়ে দই মেখে নিজে একটু মুখে দিয়ে রাধুকে দিলেন। আমি মাথা-আঁচড়ান

রেখে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। মা বলছেন, "দেখ, জয়রাম-বাটীতে কটি ছেলে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। তা, তাদের দিলুম না। তখন তারা কাকুতি করে বললে, 'তবে পায়ের একটু ধূলো দিন, মাদুলি করে রাখব'—এমনি তাদের ভক্তি-বিশ্বাস।"

মাথা আঁচড়াতে মায়ের অনেকগুলি চুল উঠেছিল। মা বললেন, "এই নাও গো, রাখ।" বস্তুতঃই আমি ধন্য হয়ে গেলুম—আমারও নেবার ইচ্ছা ছিল।

মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গেলুম। স্নান করে এসে পূজাশেষ হলেই মা প্রসাদবিতরণ করতে লাগলেন। তাতে অনেক সময় কেটে গেল।

শ্যামাদাস কবিরাজ মশায় রাধুকে দেখতে এলেন। মা রাধুকে ডেকে দিতে বললেন। আমি ডাকতে গেলুম। একটু পরে রাসবিহারী মহারাজ গিয়ে কবিরাজ মশায়কে ডেকে নিয়ে এলেন। দেখবার পর মা (কবিরাজ মশায়কে) প্রণাম করতে রাধুকে বললেন। রাধু নত হয়ে প্রণাম করলো। তিনি চলে যেতে, কেউ কেউ বললে, "উনি কি ব্রাহ্মণ?"

মা—না, বৈদ্য।

"তবে যে প্রণাম করতে বললেন?"

মা—তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ; ওঁরা ব্রাহ্মণ-

তুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না ত কাকে করবে? কি বল মা।

ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল। মায়ের খাওয়া হয়ে যেতে আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মা আমাকে বললেন, "কড়াইয়ের ডালটি বেশ হয়েছে, খাও।" নলিনী দিদি বলছেন, "তুমি রোজ এসে চলে যাও, খাও ত না, আজ বেশী করে মাছ খাও।" এই বলে অনেকগুলি মাছ দেওয়ালেন। মাছের চেয়ে ডালটাই আমার বিশেষ প্রিয়। মা ঠিকই ধরেছিলেন।

মা এইবার বিশ্রাম করবেন। গোলমাল হবে বলে আমরা পাশের ঘরে গেলুম। খানিক পরে এসেছি। মা বলছেন, "দেখছ, সব দরজা বন্ধ করে রেখেছে, গরমে প্রাণ গেল। খুলে দাও ত।" খুলে দিলুম। একটু পরেই মা উঠে কাপড় কাচতে গেলেন। ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দেওয়া হল। মা এসে উত্তরের বারান্দায় আসন পেতে বসলেন। কিছু পরে বৌ, মাকু এরা সব থিয়েটার দেখতে গেলেন। মায়ের কাছে চুপ করে বসে তাকিয়ে দেখি মায়ের মাথার সামনে অনেকগুলি পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। মনে হল প্রাতে তখন যদি তুলতুম। মাও বলছেন, "এস ত মা, আমার পাকা চুল তুলে দাও।" ঢের তোলা হল, অনেক সময় লাগল।

এইবার ভক্তেরা সব প্রণাম করতে আসবেন। আমারও গাড়ী এসেছে, কালীঘাটের বাসায় যেতে হবে। এখন থেকে মায়ের কাছে এমন করে রোজ রোজ যখন তখন আসবার সুবিধা হবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল। প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় মা বললেন, "মহাষ্টমীর দিন আসতে পার যদি এস।"

২৬শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩২৫

আজ মহাষ্টমী। মা আসতে বলেছিলেন। সকালেই আমরা দু'বোনে এসেছি। এসে দেখি, কয়েকটি স্ত্রী-ভক্ত ফুল নিয়ে এলেন। মায়ের শ্রীচরণ পূজা করে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে গেলেন। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি থাকবে ত? আজ মহাষ্টমী।" আমি বললুম, "থাকব।" কিছুক্ষণ পরেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চরণে প্রণাম করতে এলেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। মা তক্তাপোশে বসে আছেন, পা দুটি মেজেয় রেখে। আরও অনেক ভক্ত প্রণাম করলেন।

পরে মাকু প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলুম। মা আজ বাড়ীতেই স্নান করলেন। কারণ, মা একদিন অন্তর একদিন গঙ্গাস্নান করতেন। বাতের জন্য রোজ যেতেন না। এসে দেখি, বিস্তর মেয়েরা মাকে পূজা করছেন।

অনেকেই কাপড় এনেছেন। কালীঘাটে মা কালীর গায়ে যেমন কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়, পূজান্তে তেমনি করে সকলে মায়ের গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছেন। মাও এক একখানি করে দেখে নামিয়ে রাখছেন। কাউকে বা বলছেন, "বেশ কাপড়খানি!" একজন ব্রহ্মচারী সংবাদ দিলেন—এখন সব পুরুষ-ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসবেন। সে কি সুন্দর দৃশ্য! হাতে ফুল, প্রস্ফুটিত পদ্ম, বিল্বদল—একে একে সকলে পূজা ও প্রণাম করে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল সপরিবারে (প্রথম পক্ষের স্ত্রীসহ) এসেছেন। গোলাপ-মা বলছেন, "যার জিনিস সেই পেলে।" মাও বলছেন, "হ্যাঁ, যার—তারই হল। মাঝখানে দুদিন কি গোলমাল হয়ে আর একজনের (পরলোকগতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর) একটু ভোগ হয়ে গেল। এ জন্ম-জন্মান্তরের যোগ।" বলরাম বাবুর বাড়ীর সকলে এসে পূজা করে গেলেন। শেষে আমি গেলুম। পূজা করে কাপড়খানি গায়ে দিতে যেতেই মা বললেন, "ওখানা পরবো। আজ ত একখানি নূতন কাপড় পরতে হবেই।" এই বলে কাপড়খানা পরলেন। আমার চোখে জল এল। সামান্য কাপড়-খানা! সকলে কত ভাল কাপড় দিয়েছেন। আমি মায়ের গরীব মেয়ে। মায়ের অত স্নেহে আমার

লজ্জাও করতে লাগল। মা বলছেন, "বেশ পাড়টি গো।"

একটি গেরুয়াবসনধারিণী মেয়ে মাকে পূজা করে দুটি টাকা পদতলে রাখতে, মা বললেন, "ওকি! তুমি আবার কেন গো। গেরুয়া নিয়েছ, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা।"

মা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় দীক্ষিতা হয়েছ?"

মেয়েটি বললে, "দীক্ষা হয় নি।"

মা বললেন, "দীক্ষা না নিয়ে, কোন বস্তুলাভ না করে এই বেশ ধরেছ, এ ত ভাল কর নি। বেশটি যে বড়—আমারই যে জোড়হাত হয়ে প্রণাম আসছিল; ও করতে নেই, আগে বস্তুলাভ হোক। সকলে যে পায়ে মাথা দিতে আসবে, তা নেবার শক্তিলাভ হওয়া চাই।"

মেয়েটি বললে, "আপনার কাছেই দীক্ষা নেবার ইচ্ছা করেছি।"

মা বললেন, "সে কি করে হবে?" তবুও সেই মেয়েটি মিনতি করতে লাগল। গোলাপ-মাও একটু সহায় হলেন। মা অনেকটা সদয় হয়ে এসেছেন দেখলুম। মা বললেন, "দেখা যাবে পরে।"

গৌরীমা তাঁর আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে এসেছেন। সকলেই পূজা করে প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলেন।

ঠাকুরপূজা শেষ করে বিলাস মহারাজ এসে চুপি চুপি মাকে বলছেন, "আজ ঠাকুর ভোগ নিলেন কি-না কি জানি, মা। একটা প্রসাদী শালপাতা উড়ে এসে নৈবেদ্যের উপর পড়লো। এরূপ কেন হল? অনেকেই বাড়ী হতে সব এনেছে, কি হল কি জানি।"

মা বললেন, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছ ত?"

"তা ত দিয়েছি" বলে তিনি চলে গেলেন। শুনে মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। মহাষ্টমী—মায়ের শ্রীচরণপূজা সমভাবেই চলতে লাগল। স্তূপাকারে ফুল বেলপাতা বারান্দায় রেখে আসতে-না-আসতেই আবার তত ফুল পাতা শ্রীচরণতলে জমে উঠতে লাগল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভোগের সময় হল। এমন সময়ে দূর দেশ হতে তিনটি পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক মায়ের দর্শনার্থে এলেন। বড়ই দরিদ্র—একবস্ত্রে, ভিক্ষা করে টাকা সংগ্রহ করে পথ খরচ চালিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ-ভক্ত মায়ের সঙ্গে গোপনে অনেক কথা বলতে লাগলেন। কথা আর ফুরায় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগের বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে (কারণ, মা ভোগ দেবেন) মায়ের ভক্ত-ছেলেরা বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। একজন স্পষ্টই বললেন, "আর যা বলবার থাকে নীচে মহারাজদের কারো কাছে গিয়ে বলুন না।"

মা কিন্তু একটু দৃঢ়ভাবেই বললেন, "তা এখন বেলা হলে কি হবে, ওদের কথাটি ত শুনতে হবে।" এই বলে বেশ ধৈর্য্যের সহিত তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। পরে ধীরে ধীরে কি আদেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীকেও ডেকে নিলেন। অনুমানে যতটা বুঝা গেল, স্বপ্নে কোন কিছু পেয়েছেন। পরে জানা গেল স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে তাঁরা প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলেন। মা এসে বললেন, "আহা! বড় গরীব। কত কষ্ট করে এসেছে।"

পরে ভোগ হয়ে গেলে সকলে প্রসাদ পেলুম। এবার মা একটু বিশ্রাম করবেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম।

চারটা বেজেছে। মা উঠলেন। ঠাকুরের বৈকালী ভোগ হয়ে গেল। রাসবিহারী মহারাজ এসে বললেন, "একটি মেম তোমাকে দর্শন করতে এসেছেন। নীচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।" মা আসতে বললেন। মেমটি এসে মাকে প্রণাম করতেই, মা "এস" বলে তাঁর হাত ধরলেন (হ্যাণ্ড-শেক করবার মত)। মা যে বলেন, "যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন" সেটি প্রত্যক্ষ করা গেল। তারপর মেয়েটির মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। মেমটি বাঙ্গালা জানেন, বললেন, "আমি ত আসিয়া আপনার কোন অসুবিধা

করি নাই? আমি অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছি। আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, তার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন, মেয়েটি যেন ভাল হয়। সে এত ভাল মেয়ে মা! ভাল বলিতেছি কেন—আমাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ভাল বড় একটা নাই। অনেকেই বড় বদমাশ, দুষ্ট—এ আমি সত্য বলিতেছি। এ মেয়েটি সেরূপ নহে—আপনি কৃপা করিবেন।"

মা বললেন, "আমি প্রার্থনা করব তোমার মেয়ের জন্যে—ভাল হবে।"

মেমটি এ কথায় খুব আশ্বস্তা হলেন; বললেন, "তবে আর ভাবনা নাই। আপনি যখন বলিতেছেন 'ভাল হইবে' তখন ভাল হইবেই—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।" কথায় খুব জোর ও বিশ্বাস প্রকাশ পেলো। মা সদয় হয়ে গোলাপ-মাকে বললেন, "ঠাকুরের ফুল একটি একে দাও, একটি পদ্ম আন।" বিল্বপত্রের সঙ্গে একটি পদ্ম এনে গোলাপ-মা মায়ের হাতে দিলে, মা ফুলটি হাতে করে চোখ বুঁজে একটু রইলেন; পরে ঠাকুরের পানে একদৃষ্টে চেয়ে ফুলটি মেমটির হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।"

মেম হাতজোড় করে ফুল নিয়ে প্রণাম করে বললেন, "তারপর কি করিব ?"

গোলাপ-মা বললেন, "কি আর করবে? শুকিয়ে গেলে গঙ্গায় ফেলে দেবে।"

মেমটি বললেন, "না না; এ ভগবানের জিনিস ফেলিয়া দিব! একটি নূতন কাপড়ের থলে করিয়া রাখিয়া দিব, সেই থলেটি মেয়ের মাথায় গায়ে রোজ বুলাইয়া দিব।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, তাই কোরো।"

মেম—ঈশ্বর সত্য বস্তু, তিনি আছেন। আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটি শিশুর খুব জ্বর হয় আমি খুব ব্যাকুল হইয়া একদিন বসিয়া বলি, 'হে ঈশ্বর, তুমি যে আছ ইহা ত আমি অনুভব করি; কিন্তু আমাকে প্রত্যক্ষ কিছু দাও।' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটি রুমাল পাতিয়া রাখি। অনেকক্ষণ পরে দেখি সেই রুমালে ভাঁজের মধ্যে তিনটি কাঠি। আমি অবাক হইয়া সেই কাঠি তিনটি লইয়া উঠিয়া আসিয়া শিশুটির গায়ে ক্রমান্বয়ে তিনবার বুলাইয়া দিলাম, সেইক্ষণে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।" ইহা বলতেই টস্ টস্ করে মেমটির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল; তারপর বললেন, "আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম, আমায় মাপ করিবেন।"

মা বললেন, "না, না, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি ভারি খুশি, তুমি একদিন মঙ্গলবারে এস।" মেমটি প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

যোগীন-মার পিঠে ফোড়া হয়েছে; অস্ত্র হয়েছে। মা বলছেন, "আহা! আজকার দিনে যোগীন পড়ে রইল! কত কি করবে মনে সাধ ছিল। একবার এ ঘরে আসতেও পারলে না।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যোগীনের কাছে যাচ্ছ কি? বোলো—আমি একটু পরেই আসছি।" যোগীন-মাকে দেখে মায়ের কাছে ফিরে এসে দেখি শ্রীমান্ প্রিয়নাথ প্রণাম করছে। মা মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। প্রিয়নাথের চোখে ছাতির শিকে ভয়ানক খোঁচা লেগেছে, ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। তাই দেখে মা ভারি ব্যস্ত হয়েছেন; বারে বারে বলছেন, "আহা, ভাগ্যে চোখটি নষ্ট হয়নি গো।" এইবার আমার রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। একটু পরে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বললেন, "আবার এস।"

২রা কার্ত্তিক, শনিবার, ৺লক্ষ্মীপূজা—১৩২৫

সকালেই আমরা দু' বোনে মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে গিয়েছি। সুমতির ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে গিয়েছে।

মা ঠাকুরঘরে বসে ফল কাটছিলেন ; দেখে বললেন, "এই যে সব, এস গো, বস। কবে এলে।"

আমি বললুম, "মহাষ্টমীর দিন রাত্তিরেই চলে গিয়েছিলুম আবার কাল রাত্তিরে এসেছি।"

মা—এখন কি থাকা হবে ?

"না, মা।"

মা সুমতিকে বললেন, "বৌমা, ভাল আছ ? ভাসুরঝিটি কেমন আছে ?"

দুটি মহিলা দীক্ষা নিতে এসেছেন। তাঁরা এসে প্রার্থনা জানাতেই মা বললেন, "হ্যাঁ, আরও দুটি ছেলে আছে।" বলতে বলতে আর একটি মহিলা এসে বললেন—তিনিও দীক্ষা নিতে এসেছেন। মা বললেন, "তবে ত অনেকগুলি হল গো।"

সুমতি শ্রীশ্রীমাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করা ও লালপেড়ে শাড়ী দেওয়া স্বপ্নে দেখেছে। তাই দেবে বলে নিয়ে এসে লজ্জায় মাকে বলতে পারছে না ; বলছে, "দিদি, তুমি বল।" আমি ঐকথা মাকে বলতেই, মা হেসে বললেন, "জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কি বল মা ? তা দাও, শাড়ীখানি ত পরতে হবে।" চওড়া লালপেড়ে শাড়ীখানি মা পরলেন ; কি চমৎকার দেখাতে লাগল ! মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম—চোখে জল

এল। সুমতি বলছে, "একটু সিঁদুর দিলে বেশ হতো।"

মা সহাস্যে বললেন, "তা দেয় ত।" কিন্তু সিঁদুর নিয়ে যায় নি বলে দেওয়া হল না। আমরা বাসায় ফিরবো বলে প্রণাম করছি। মা বললেন, "তুমিও যাবে এখুনি?"

আমি—হ্যাঁ মা, যেতে হবে। বাসায় একটু বেশী রান্নার কাজ আছে।

মা—আবার আসবে?

আমি—হ্যাঁ, বিকেলে আসব।

মা অনেকগুলি রসগোল্লা নিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ছেলেদের হাতে দিলেন। আমরা বিদায় নিলুম। বিকেলে লক্ষ্মীপূজা বলে নারকেলের খাবার সব নিয়ে গেছি। দেখে মা বলছেন, "কি গো, আজ লক্ষ্মীপূজা তাই বুঝি এ সব।" ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রী-ভক্ত নানারূপ মিষ্টদ্রব্য নিয়ে মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে এলেন। কোন বাড়ী থেকে মিষ্টির সঙ্গে ডাব চিঁড়ে এই সবও দিয়েছে। দেখে মা বলছেন, "কোন্ দিনে কি দিতে হয়, তা ওরা সব বেশ জানে।" সন্ধ্যারতির পর ঠিক সময়ের মধ্যে ভোগ দেওয়া হল। শ্রীশ্রীমা নীচে ভক্তদের জন্য চিঁড়ে নারকেল ইত্যাদি প্রসাদ সব পাঠালেন। উপরে মেয়েরাও সকলে পেলেন।

একটি স্ত্রীলোক লক্ষ্মীপূজার তাবৎ উপকরণ নিয়ে এসে মায়ের শ্রীচরণপূজা করলেন। পরে চারটি পয়সা পদতলে রেখে প্রণাম করলেন। মা আমাদের বললেন, "আহা! ওর বড় দুঃখ * মা, বড় গরীব।" মা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মঙ্গলবারে সেই মেমটি এসেছিলেন, মা?"

মা বললেন, "হ্যাঁ মা, এসেছিল।" মেমটির উপর মায়ের বিশেষ কৃপা। তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, খুব ভালবাসেন। তাঁর মেয়েটিও সেরে উঠেছে।

রাত হল দেখে প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

১১ই চৈত্র, ১৩২৬

শ্রীশ্রীমা দেশে গিয়েছিলেন, প্রায় এক বৎসর পরে ফাল্গুন মাসে বাগবাজারের বাটীতে শুভাগমন করেছেন। শরীর নিতান্ত অসুস্থ। অনেকদিন যাবৎ মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে—ম্যালেরিয়া। শ্রীচরণদর্শন করতে গিয়ে দেখি মা কাপড় কাচতে গেছেন। কলঘর হতে বেরিয়ে বললেন, "বস, আমি আসছি।" মিনিট পাঁচ পরেই

---

* একমাত্র পুত্র বি-এ পাশ করে পাগল হয়েছে এবং তদবধি নিরুদ্দেশ। স্বামীও পুত্রশোকে প্রায় উন্মাদের মত হয়েছেন।

কাপড় ছেড়ে, সর্ব্ব দক্ষিণের ঘরে মায়ের বিছানা করা ছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীচরণে প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন; বললেন, "বস, কেমন আছ?" সেবার জন্য কিছু দিলুম—টাকা হাতে করে নিয়ে রাখলেন। মায়ের শরীর দেখে আমার আর কথা বেরুচ্ছে না—শুধু মুখের পানে চেয়ে আছি, আর ভাবছি—সেই শরীর এমন হয়ে গেছে! সঙ্গে সুমতিদের ঝি গিয়েছিল, সে প্রণাম করবার উদ্যোগ করতেই মা তাকে বললেন, "তুমি ওখান হতেই কর।" সে দরজার গোড়ায় প্রণাম করে চলে গেল।

মা এত দুর্ব্বল যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল। নীচেই বসে আছি। ইতোমধ্যে রাসবিহারী মহারাজ এসে মাকে বেশী কথা কইতে নিষেধ করে গেলেন। তবু মা মাঝে মাঝে দু' চারটি কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বসে আছি, এই সময় রাধারাণী ছেলে কোলে করে এলেন, ছেলেটির অসুখ। আমি ছেলেটির হাতে কিছু দিয়ে দেখলুম। রাধু ত কিছুতেই তা নেবে না। মা বললেন, "সে কি রাধু, দিদি আদর করে দিচ্ছে আর তুই নিবি নে?" এই বলে নিজেই তুলে রাখলেন। ছেলেটি শুধু মা ও দিদিমার জন্যই নাইবার খাবার অনিয়মে অসুখে ভুগছে

বলে কত আক্ষেপ করলেন। রাধু ত ঢের কটূক্তি করে তার প্রতিবাদ করতে লাগল। "ওকে বলে কোন ফল নেই" বলে মা চুপ করে গেলেন। খানিক পরে সরলা, কৃষ্ণময়ীদিদি প্রভৃতি এলেন। মা শুয়েই তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সরলা কৃষ্ণময়ীদিদির নাতনীর অসুখে শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন, সেই সব কথা হতে লাগল।

১৭ই চৈত্র, ১৩২৬

পাঁচ ছ দিন পরে গেছি, সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্রীশ্রীমা খাটের উপর শুয়েছিলেন। নিকটে গিয়ে দাঁড়াতে উঠে বসলেন। প্রণাম করে আদেশ মত বসলুম। ঘরে সরলা, নলিনী ও বৌ আছেন; বৌ ও নলিনী জপ করছেন। কিছু সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলুম। আরতি-শেষ হলে মা বিলাস মহারাজকে তা ভোগ দিতে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পরে দিলে হবে না?" মা বললেন, "না, এখনি দাও।" তিনি আদেশ পালন করলেন। তিনি ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীদর্শনে গিয়েছিলেন, প্রসাদ এনেছেন। ঐ কথা বলে ৺দেবীর প্রসাদ একটু মাকে দিয়ে আমাদের সকলকেও কিছু কিছু দিলেন।

মা সরলা নলিনী প্রভৃতিকে পূর্ব্বোক্ত প্রসাদ নিয়ে জল খেতে বললেন এবং আমাকেও দিতে বললেন। শেষে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আজ দুদিন জ্বর হয় নি—একটু ভালই আছি, মা। আর মা, এই রাধুর জন্যেই আমার সব গেল—দেহ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অর্থ, যা কিছু বল। ছেলেটাকে ত মেরেই ফেলবার জো করেছে। এই এখানে এসে সরলার হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। আর কাঞ্জিলাল দেখছে। কাঞ্জিলাল বলেইছে, 'এ রাধুর কাছে থাকলে আমি চিকিৎসা করতে পারব না।' ঠাকুরের যে কি ইচ্ছে—ওকে আবার ছেলে দেওয়া কেন—যে নিজের দেহেরই যত্ন জানে না। আবার ত এক নূতন রোগ করে বসেছে। এ কি হল মা? যা হোকগে, আমি আর ওদের নিয়ে পারি নে। বাড়ীতে কি অত্যাচারই করতো! আমাকে কি ওরা গ্রাহ্য করতো?" এমন সময় খবর এল ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। ডাক্তার বাবু মাকে দেখছেন এমন সময় রাধু এসে বললে, "আমার হাতটা দেখ ত। নীচে লোহার থামে লেগে ফুলেছে, ছড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরিয়েছে।" বৌ তার ওপর একটা ময়লা ন্যাকড়া রেড়ির তেলে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ডাক্তার বাবু বললেন, "শীগ্‌গির খুলে

ফেল, সাবান দিয়ে ধুয়ে দাও। অমন ন্যাকড়া দিয়েও বাঁধ্‌তে হয়? এখনি বিষিয়ে উঠবে। কলকাতার হাওয়ার সঙ্গে বিষ চলে।" ইহা বলে তিনি উঠে গেলেন। মা তখন দুঃখ করছেন, "আহা, বাছার আমার কতই লেগেছে! মরে যাই। আহা, ও জনমদুঃখী আমার। শরীরে কি আর আছে! আহা, কাঞ্জিলালকে একটু ওষুধ দিতে বল। ভাল করে দাও গো।"

একে একে ঠাকুরঘর থেকে সকলে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বৌ এসে বললেন, "ভাল করে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে।"

পরে মা শুয়ে বললেন, "পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, মা।" পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, "মা, একটি কথা বলতে চাই—আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত?"

মা—না, না, বল না কি?

আমি বললুম।···শুনে মা বললেন, "আহা! সে আনন্দ কি আর রোজ রোজ হয় মা? সব সত্যি, সব সত্যি, কিছু মিথ্যে নয় মা—উনিই সব। উনিই প্রকৃতি, উনিই পুরুষ। ওঁ (ঠাকুর) হতেই সব হবে।"

আমি—মা, এক একদিন একমনে মন্ত্র জপ করবার পরে দেখি অনেক সময় কেটে গেছে। আর যে সব করতে বলেছেন সে সব কিছুই করা হয় নি। তখন

তাড়াতাড়ি সেই সব সেরে উঠে পড়তে হয়, কারণ সংসারের কাজে ত্রুটি হলে ত আবার চলে না—এতে কি অপরাধ হয়, মা ?

মা—না, না, ওতে কোন অপরাধ হয় না।

আমি—একজন বললে, কোন কোন দিন গভীর রাত্রে ধ্যানে একটা ধ্বনি শুনতে পাই—বেশীর ভাগই শুনি যেন শরীরের ডান দিক হতে উঠছে। কখনো (মন একটু নাবলে পর) বাঁদিক হতেও হচ্ছে শুনি।

মা—(একটু চিন্তা করে) হাঁা, ডানদিক হতেই হয়। বাঁ দিক দেহভাবের। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে এই সব অনুভব হয়—ডানদিক হতে যেটি হয়, এ-ই ঠিক। শেষে মনই গুরু হয়। মন স্থির করে দু মিনিট ডাকতে পারাও ভাল।

'দেহভাবের'—কথাটি যতটুকু বোঝা গেল, তা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল না—মায়ের দেহ অসুস্থ।

বৌ এসে মশারি ফেলে দিতে চাইলে। আমি বিদায় নেব ভাবচি। মা অমনি মাথাটি বালিশ হতে তুলে বললেন, "এই নাও গো, আমি মাথা তুলেছি।" শয়নাবস্থায় না-কি প্রণাম করতে নেই। প্রণাম করতেই বললেন, "এস মা, আবার এস। একটু

বেলাবেলি এস। কাজকর্ম্ম সারা হয়ে ওঠে না বুঝি? দুর্গা, দুর্গা, এস, মা, এস।" বৌ মশারি ফেলে দিয়েছে, তবু মশারি হতে মা শ্রীমুখখানি বের করে রেখে বিদায় দিচ্ছেন। ঘরের বাইরে বারান্দায় এসেছি, তখনও শুনছি মা করুণাপ্লুত স্বরে বলছেন, "দুর্গা, দুর্গা।" কি অসীম ভালবাসা! যতক্ষণ কাছে থাকা যায় সংসারের শোক-তাপ সব ভুল হয়ে যায়।

মায়ের অসুখ সমভাবেই চলেছে। শরীর ক্রমশঃ খুব দুর্ব্বল হচ্ছে। সে দিন বিকেল বেলা গেছি। মা উঠে কলঘরে যাবেন; বলছেন, "হাতখানা দাও ত মা, ধরে উঠি। প্রায়ই জ্বর হয়, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল।" মা কষ্টে উঠলেন। উঠে এসে বলছেন, "এই দেখ গো, দোর-গোড়ায় কে একগাছি লাঠি রেখে গেছে। কদিন থেকেই ভাবছি—একগাছি লাঠি পাই ত ভর দিয়ে একটু যেতে আসতে পারি। তা দেখে ঠাকুর ঠিক এনে জুগিয়ে রেখে দিয়েছেন।" হাতে করে তুলে লাঠিগাছা দেখালেন। হাসতে হাসতে বলছেন, "জিজ্ঞাসা করলুম—কে লাঠি ফেলে গেছে গো? তা, কেউ বলতে পারলে না।"

আর একদিন গিয়ে শুনি, মায়ের এত কষ্ট দেখে মায়ের সাধু ছেলেরা বলছেন, "এবার মা, ভাল হয়ে

উঠলে আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেব না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার কষ্টভোগ।” মা শুনে মৃদু মৃদু হাসলেন, বললেন, “কেন গো? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন!” সকলেই নিরুত্তর। হায় মা, তোমার এ করুণাপূর্ণ কথায় যে কত কথাই না ব্যক্ত করলে, মূঢ় আমরা তার কি বুঝি!

এই কথায় মনে পড়ে—একটি সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্ম্মবিপাকে দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণা হয়ে পড়েন; তবে তাঁর পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিও ছিল, তাই একদিন কোন সাধুর দৃষ্টিপথে পড়ে সদুপদেশ পেয়ে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রম বুঝতে পেরে বিশেষ অনুতপ্তা হন এবং সেই সাধুর উপদেশে একদিন বাগবাজারের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতে সঙ্কুচিত হয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিজের সমস্ত পাপের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করে বললেন, “মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্যা নই।” শ্রীশ্রীমা তখন অগ্রসর হয়ে নিজের পবিত্র বাহুদ্বারা মহিলাটির গলদেশ বেষ্টন করে ধরে সস্নেহে বললেন, “এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা

বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্তা হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি?”

মানুষের পাপতাপ রোগশোকের ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে তাঁর মত দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণীই হাসি মুখে বলতে পারেন, “কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন!”

১লা বৈশাখ, ১৩২৭

সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি মায়ের জ্বর। রাসবিহারী মহারাজ মায়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ব্রহ্মচারী বরদা পদসেবা করছেন। থার্মোমিটার দেওয়া হয়েছে। মা চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে। মা একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে?” রাসবিহারী মহারাজ কি যেন মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন। বৌও কাছে আছে। জ্বর দেখে ১০০˙১ বললেন যেন শুনলুম।

সুধীরাদিদি নববর্ষ বলে মেয়েদের ভোজ দিচ্ছেন। তাই সরলাদিদি চারটের সময় স্কুল বোর্ডিংএ গেছেন। বরদা ব্রহ্মচারীকে মা বললেন সরলাদিদিকে ডেকে আনতে। তিনি এসে রাধুর ছেলেকে খাওয়াবেন।

এখনও সময় হয়নি খাওয়াবার; কিন্তু কাঁদছে বলে রাধু আবার তাকে এখনি খাওয়াতে চাইছে। মা বারণ করছেন বলে রাধারাণী রেগে তাঁকে গালাগালি দিতে লাগল—"তুই মর, তোর মুখে আগুন।" শুনে আমাদের মহা বিরক্তি বোধ হতে লাগল—মায়ের এই অসুখ! আর এই সময়ে অমন সব গালাগালি দেওয়া! রাধু কিন্তু আরও কত কি বলে চেঁচাতে লাগল। এইরূপ প্রায়ই হয়, কিন্তু মায়ের অসীম ধৈর্য্য—চিরদিনই চুপ করে সহ্য করে যান। এবার দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে আজ তিনিও বড় ত্যক্ত হয়ে উঠলেন; বললেন,"হ্যাঁ, টের পাবি, আমি মলে তোর কি দশা হয়! কত লাথি ঝাঁটা তোর অদৃষ্টে আছে, জানি না। আজ এই বৎসরকার দিনে আমি সত্য বলছি তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।" একথা শুনে রাধু যে-সব কথা বললে তা আর লিখতে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে সরলাদিদি এলেন এবং ছেলেকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমাদের মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। মা আবেগভরে বললেন, "বাতাস কর মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়।" একটু বাতাস করতেই আবার পায়ে হাত বুলুতে বললেন। পদসেবা করছি এমন সময় রাসবিহারী মহারাজ এসে মশারি

ফেলে দিতে ব্যস্ত হলেন। অগত্যা আমি বললুম, "তবে আমি আসি, মা।"

মা বললেন, "এস।"—এই-ই শেষ আদেশ ও শেষ কথা শুনে এলুম।

আমাকে কালীঘাট চলে আসতে হল। তারপর সকলের অসুখ-বিসুখে আর যাবার সুবিধা করেই উঠতে পারি নি। মায়ের দেহ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে—খবর পাচ্ছি। শেষে যে দিন গেলুম, দেখে মনে হল আমাদের সব শেষ—তথাপি আশা।

শ্রীমতী—

১৯১০ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলং হইতে আমরা কয়েক জনে মিলিয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন-মানসে যাই। মায়ের পূর্ব্বেকার ফটোগ্রাফ আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। এই সময় পথে মায়ের বর্ত্তমান সময়ের মূর্ত্তি একজন স্বপ্নে দেখিয়া এবং পরে জয়-রামবাটী যাইয়া প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট চেহারার খুব মিল হওয়ায় আমাদের অপার আনন্দ ও বিস্ময় হইল। আমাদের একজন পূর্ব্বেই জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষার কথায় শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "সন্ন্যাসীর মন্ত্র—চৈতন্য হবে।" তিনি ব্যতীত আমরা সকলেই এবারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র পাইলাম। দীক্ষার পরেই কামারপুকুর যাইবার ইচ্ছা করিয়া আমরা শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "তা কি হয়? আমি ছেলেদের আজ ভাল করে খাওয়াব।"

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥"

ইত্যাদি গীতায় পড়িয়াছি। অতএব ভব-বন্ধন-মোচনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পরে আমাকে আর কি

করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আমাকে আর কি করতে হবে?"

মা—তোমার কিছুই করতে হবে না।

আমি—আমার কিছুই করতে হবে না?

মা—না।

আমি—কিছু না?

মা বলিলেন, "না, কিছুই না।" বারত্রয় এই একই উত্তরে তখনকার মত বুঝিলাম যে যিনি কৃপা করিয়াছেন, তিনিই ভব-বন্ধন-মোচনের সব ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি ভানু পিসীর* হাত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "পিসি, তুমি আরও ২৫ বৎসর বাঁচবে।" তিনি গিয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তোমার ছেলে হাত গুণতে জানে।" মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি হাত দেখতে জান? বল ত আমার পায়ের অসুখ (বাত) সারবে কি না?" প্রশ্ন শুনিয়া ত আমি অবাক! কারণ, জ্যোতিষের কিছুই জানি না। ভানু পিসীকে আন্দাজে অমনি একটা বলিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম—ভক্তদের শরীরস্থ পাপ গ্রহণ করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের এই পায়ের অসুখ; তাই

---

* জয়রামবাটীর জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত; ঠাকুরের সমসকার।

বলিলাম, "আমাদের জন্যই ত এই অসুখ, তা আমরা থাকতে সারবে কি?" শুনিবামাত্র মা নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া দাঁড়ান অবস্থা হইতে হঠাৎ ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, বলে কি গো?" মাকে এইরূপ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, "মা, তোমার ভাল হতে ইচ্ছা হয়?"

মা—হ্যাঁ।

আমি বলিলাম, "তবে ত ভাল হবেই।" তখন মায়ের মুখে প্রফুল্লতা আসিল। ক্ষণ পরেই মা বলিলেন, "দেখছ গা, কি ভক্তি। সবই আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর।"

দেশে ফিরিবার দিনে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। আমি বলিলাম, "মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলে ত মুখ চলে না, হাতমুখ চলে ত মন স্থির হয় না।"

মা উত্তর করিলেন, "এর পর দেখবে, হাতজিবও চলবে না—শুধু মনে।"

আসিবার সময় প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, যাই।" মা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, 'আসি' বল, 'যাই' বলতে নেই।"

ভুল সংশোধনপূর্ব্বক মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়া রওনা হইলাম।

১৯১২ খৃঃ দুর্গাপূজার পরে শ্রীশ্রীমা যখন কাশী গিয়াছিলেন সেই বার মায়ের জন্মতিথির সময় ডিসেম্বর মাসে আমরা কাশীতে যাই। জন্মতিথির দিনে সকাল বেলা 'লক্ষ্মী-নিবাসে' মাকে প্রণাম করিয়া ফুলের মালা দিয়া পূজা করিলাম। মা এক একটি প্রসাদী মালা সকলকে দিলেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ (মিষ্টি) গ্রহণ করিয়া 'অদ্বৈত আশ্রমে' আসিলাম। তথায় জন্মতিথি-পূজান্তে যখন হোম হইতেছিল এবং সকলে মিলিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, আমরাও তখন আহুতি দিতে উদ্যত হইলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তোমরা খেয়েছ, আহুতি দিও না।" কিন্তু আমি বাদে অপর সকলে আহুতি দিলেন। শ্রীশ্রীমাও এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মা স্ত্রী-ভক্ত-দিগকে বলিয়াছিলেন, "এরা ত আমার প্রসাদ পেয়েছে, খেল কখন? আহুতি দেবে বই কি।" স্ত্রী-ভক্তদের নিকট পরে এই কথা শুনিয়াছিলাম।

* * *

১৯১৩ খৃঃ মাঘী অষ্টমীতে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাইয়া পরিবার ও বিধবা ভগ্নীকে মায়ের কৃপালাভের আশায় তাঁহার শ্রীচরণসমীপে লইয়া যাই। ঐদিন মা উভয়কেই দীক্ষা দেন। পরিবার মাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, "মা, আমার শিবপূজা করতে ইচ্ছা হয়। তা করবো কি?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "এখন তুমি ছেলে মানুষ, পারবে না। পরে সময় হলে শিখে নিয়ে শিবপূজা করো। এখন শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা কর।" মা আমার ভগ্নীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওর মন খুব ভাল।" আমরা আম লইয়া গিয়াছিলাম। ঐ সময় আমের মূল্য বেশী ছিল। মা ঐ আম দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এত পয়সা দিয়ে আম কেন? আর এই আম এখন খেতেও ভাল নয়—টক্।"

*　　*　　*

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা মিলিয়া জয়রামবাটী যাই। সঙ্গে একজনের একটি অল্পবয়স্ক পুত্রও ছিল। সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলাম। ছুটির সময় অল্প বলিয়া উক্ত মঠে থাকিবার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সেই রাত্রিতেই জয়রামবাটী রওনা হইলাম। পথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভীষণ অন্ধকার। পথঘাট কাদা জলে পূর্ণ। এই সব দুর্য্যোগ অতিক্রম করিতে করিতে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাদের পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সে রাত্রে মাকে আর কোন সংবাদ

দেওয়া হয় নাই। পর দিন সকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে যাইলাম তখন মা এই সকল শুনিয়া আমাদের ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি-জল-কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ। এই ভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়। গোঁভরে চলা ভাল নয়।"

আমরা বলিলাম, "মা, তোমাকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল, তার উপর ছুটিও অল্প, তাই অত তাড়াতাড়ি।"

মা—তোমাদের ত এরূপ ইচ্ছা হবেই, কিন্তু এতে আমার কষ্ট হয়।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধানা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা সুধীরাদিদি তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। এই দিন দুপুর বেলা মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, সুধীরা তোমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যাবে। খুব সাবধানে যেও। ওর গাড়ী তোমাদের দুই গাড়ীর মধ্যে রেখো। তোমরা আমার আপনার জন, আমার ছেলে।"

আমি—হ্যাঁ, নেব বই কি। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনি ভাবে নেব।

রাত্রিতে আহারের সময় মা আমাদের নিকট বসিয়া

কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই ছোট ছেলেটির দীক্ষার কথা উত্থাপন করায় মা বলিলেন, "এখন ছেলে মানুষ, হেগে ছোঁচাতে পারে না; (৭।৮ বছর বয়স) এখন কি দীক্ষা হয়? ছেলেটি ভক্ত, বেঁচে থাক্। ভক্তদাস হোক্।" আমাকে বলিলেন, "ওর ভাত মেখে দাও।"

আমি কথায় কথায় বলিলাম, "মা, আমরা যার তার খাই—এতে কোন হানি হয় কি?"

মা—শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে ঠাকুর বিশেষ নিষেধ করতেন, ওতে ভক্তির হানি হয়। সকল কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনা হয় বটে, তবু তিনি শ্রাদ্ধান্নটা খেতে নিষেধ করতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করবো?"

মা—আত্মীয়-স্বজনের বেলা না খেয়ে উপায় কি?

পরদিন বৈকালে প্রায় ২টার সময় মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। মা আলুথালু ভাবে মাটিতেই বসিয়া আছেন। ঐ বৎসরেই উহার কিছুদিন পূর্ব্বে দামোদরের ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বন্যায় লোকের কি খুব কষ্ট হচ্ছে?" খবরের

কাগজে ও লোকমুখে যাহা জানিয়াছিলাম তাহাই বলিতে লাগিলাম। মা নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, জগতের হিত কর।" মায়ের এই কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার এই বিরাট বিগ্রহের সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়া বাহির বাটীতে আসিব বলিয়া প্রণাম করিতেই শুনি—মা আপন মনে বলিতেছেন, "কেবল টাকা, টাকা, টাকা।" মায়ের মুখে "টাকা, টাকা" শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মা বোধ হয় আমার ভিতর ভাবের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। অমনি মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না বাবা, টাকাও দরকার। এই দেখনা কালী (মামা) কেবল টাকা, টাকা করে।"

* * *

১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে (২৪শে) সপরিবারে মাকে দর্শন করিতে 'উদ্বোধনে' গিয়াছি। পরিবারের হাতে কিছু মিষ্টি ছিল। শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা উহা অন্য-দিন ঠাকুরকে দিবেন ভাবিয়া উঠাইয়া রাখিতেছিলেন। মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না গো, না, বৌমা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে তা এবেলাই ঠাকুরকে দাও, এতে বৌমার কল্যাণ হবে।" পরদিন প্রত্যূষে পরিবার মায়ের

নিকট গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আমাকে বলিল—

"আজ মা আমাকে কত কৃপা করেছেন! জীবনে চিরকাল তা আনন্দ দেবে। বেলা নটা দশটার সময় মা তিন পয়সার মুড়ি ও কড়াইভাজা আনিয়ে আঁচলে নিয়ে মাটিতে বসে দু-চারটি করে নিজে মুখে দিচ্ছিলেন এবং এক মুঠো এক মুঠো করে আমাকে দিচ্ছিলেন—বৌমা, খাও। জীবনে অনেক ভাল জিনিস খেয়েছি, কিন্তু আজকের ঐ মুড়ি খাওয়ার আনন্দের তুলনা মেলে না। দুপুরে আমাকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন এবং তাঁর বিছানাপত্র ঝেড়ে রোদে দিতে বললেন। এই সব ছোটখাট সেবা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থা করেছেন। আজ আমার সঙ্গে এই কথাবার্তাও হয়েছে—আমি বলেছিলাম, 'মা, ঠাকুরকে অন্নভোগ দিব?'

মা—হ্যাঁ, ঠাকুরকে অন্নভোগ দেবে। তিনি স্থক্ত খেতে ভালবাসতেন।

আমি—ঠাকুরকে মাছভোগ দেব কি?

মা—হ্যাঁ, তাঁকে মাছ দেবে। ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে নিবেদন করবে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলে মাছ খায় কি?'

আমি—হ্যাঁ, খান।

মা—খাবে বই কি, খুব খাবে।

কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, 'মা, এই যুদ্ধে দেশব্যাপী হাহাকার, লোকের কত কষ্ট, অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য!'

মা—এতেও ত লোকের চৈতন্য হয় না।

আমি—মা, এই যুদ্ধে কি আমাদের ভাল হবে?

মা—ঠাকুর যখনই আসেন, তখনই এরূপ হয়ে থাকে। আরও কত কি হবে!”...

ঐদিন বৈকালে আমি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম, মা সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে রাত্রে অন্ধকারে বৃষ্টিতে জয়রামবাটী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আবার তিরস্কার করিলেন, “গোঁভরে চলা ভাল নয়।”

আমি—না, আর যাব না।

মা বোধ হয় এ কথায় বুঝিলেন আমি আর জয়রামবাটী যাইব না। অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, “যাবে বই কি। বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে।” পরিবারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বউ মা, তুমি ওকে দেখো, এইভাবে যেন না চলে।”

* * *

১৯১৭ খৃঃ দুর্গাপূজার ছুটিতে ‘উদ্বোধনের’ বাটীতে আমি ও আর একটি গুরুভ্রাতা (যতীন) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। আমরা মায়ের জন্য দুইখানি বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলাম। বস্ত্র দুইখানি মায়ের শ্রীচরণপ্রান্তে

রাখিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ, তোমাদের কাপড় দেওয়া কেন?" উভয়ে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলাম, "মা, তোমার ধনী ছেলেরা তোমাকে দামী কাপড় দেয়। তোমার গরীব ছেলেরা এই মোটা কাপড় নিয়ে এসেছে। তুমি গ্রহণ করে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।" শুনিয়াই সস্নেহে মা বলিলেন, "বাবা, এই আমার গরদ, ক্ষীরোদ নীরদ।" ইহা বলিয়া বস্ত্র দুইখানি সযত্নে হাত পাতিয়া লইলেন। মা দাঁতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'যার দাঁতের বেদনা হয় নাই, সে দাঁতের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না।' "

* * *

১৯১৭ খৃঃ রাঁচীতে ঠাকুরের উৎসবের পূর্ব্বে মাকে পত্র লিখিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম যাহাতে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন, "তোমাদের পত্র পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। তোমাদের এই সকল সৎকার্য্যের সহায় তিনি নিজে। তার জন্য তোমাদের ভয়-ভাবনা কি?"

১৯১৯ খৃঃ জ্যৈষ্ঠমাসে জয়রামবাটীতে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করলে তিনি শুনেন কি? আর তোমার নিকট না বলে ঠাকুরের নিকট বলতে হয় কি?"

তদুত্তরে মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যদি সত্য হন, শুনেনই শুনেন।"

এবারে আমি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জয়রাম-বাটী হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "যদি দিনের বেলা বলে গরুর গাড়ী না পাই, তবে কোতুলপুর হতে হেঁটেই বিষ্ণুপুর যাব, মা।"

মা বললেন, "বাবা, শরীরটাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? গাড়ী পাবে।" মায়ের কথা ঠিক হইল। গাড়ী পাইলাম। ইহাই দেহাশ্রিতা মাকে আমার শেষ দর্শন।

শ্রী—

(৩)

১৯১৬ খৃঃ মঠে দুর্গাপূজা। শ্রীশ্রীমা সপ্তমী পূজার দিনে দুপুরে মঠে আসিয়া উত্তর পাশের বাগান বাড়ীতে আছেন। অষ্টমীর দিন সকাল বেলা আটটা নয়টার সময়ে মঠ ও প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রান্নাঘরের পাশের 'হলে' ভক্তেরা ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেকে কুটনো কুটিতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন, "ছেলেরা ত বেশ কুটনো কুটে।" জগদানন্দজী বলিলেন, "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই হল উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক্, আর কুটনো কুটেই হোক্।"

এই দিনে বহুলোক শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে বারবার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগীন-মা বলিয়াছিলেন, "মা, ও কি হচ্ছে? সর্দ্দি করে বসবে যে।"

মা বলিলেন, "যোগেন, কি বল্‌বো, এক একজন প্রণাম করে, যেন গা-ঠাণ্ডা হয়, আবার এক একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিমাম, "মা, এক একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয়, একবার পূজার সময় তোমার এই কথা শুনেছিলুম।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলতায় হুল ফুটিয়ে দেয়। কাউকে কিছু বলিনে।" এই কথা বলিয়াই সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিলেন, "তা বাবা, তোমাদের বলছি নে।"

আমি বলিলাম, "মা, ভয় হয় তোমার মত মা পেয়েও কিছু যেন হল না মনে হয়।"

মা—ভয় কি বাবা, সর্ব্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব'। যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা ত ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।

একবার ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি—ছবি হইতে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়িয়াছে। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যা দেখি সে কি

মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না বাবা, ও সব ঠিক।"

আমি—তুমি কি জান কি দেখি?

মা—হ্যাঁ।

আমি—ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?

মা—হ্যাঁ।

আমি—বুঝবো কি করে?

মা—কেন, গীতায় পড় নাই—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি তুমি ভগবান?" এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

শ্রী—

২৭শে চৈত্র, ১৩২৩, জয়রামবাটীতে সন্ধ্যার পর মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছিল।

আমি—মা, সবাই বলে কল্পতরুর কাছে গেলে কিছু চাইতে হয়। কিন্তু ছেলেরা আবার মার কাছে কি চাইবে? যার যা দরকার মা তাকে তাই দেন। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'যার যা পেটে সয়, মা তাকে তাই দেন।' তা কোন্‌টা ঠিক?

মা—মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে! শেষে কি শিব গড়তে বানর হয়ে যাবে! তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার, তেমন দিবেন। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা কামনা করতে হয়—এ কামনা কামনার মধ্যে নয়।

আমি—ঠাকুর বলেছেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আবার স্বামীজী বলেছেন, 'সন্ন্যাস না হলে কারোও মুক্তি নেই।' গৃহীদের তবে উপায়?

মা—হ্যাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামীজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃ-সন্ন্যাসের দরকার নেই। তাদের অন্তর-সন্ন্যাস আপনা

হতে হবে। তবে বহিঃ-সন্ন্যাস আবার কারো কারো দরকার। তোমাদের আর ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে। আর সর্ব্বদা জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।

* * *

১৩২১, চৈত্র—'উদ্বোধন' বাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

একবার আমার গর্ভধারিণী মাকে তীর্থদর্শনে কাশী লইয়া যাইতে ইচ্ছা করায় তিনি অকাল বলিয়া অমত করেন। আমি এই কথা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "বাবা, অকালে তীর্থ-দর্শন করলে পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় বলে, কিন্তু আবার পুণ্যকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলা ভাল।"

মায়ের এই দ্ব্যর্থ্যক বাক্য বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় সংশয় জ্ঞাপন করিলাম এবং এইরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

মা—সংসারীদের মতে একটা কথা আছে যে অকালে তীর্থদর্শন করে না। দেখ, কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্যকার্য্য স্থগিত রাখা যায়, কিন্তু কালের (মৃত্যুর) নিকট কালাকালের বিচার নাই। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নেই, তখন সুযোগ উপস্থিত

হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্যকার্য্য করে ফেলা ভাল।

* * *

(অপর এক সময়ে আমার একটি বন্ধুর হাসপাতালে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অকালে মৃত্যু হয়। তাহার বিমল স্বভাব ও ঈশ্বরানুরক্তির কথা মায়ের নিকট চিঠিতে জানাইয়া তাহার মুক্তিভিক্ষা করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করি যে তোমার বন্ধুটির মুক্তিলাভ হউক। ঠাকুর তাহাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।")

শ্রী—

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ৺কালীপূজার পূর্ব্বে শিলং-এর চন্দ্রকান্ত ঘোষের অনুরোধে ও উৎসাহে আমি শিলং হইতে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করিতে আসি। কলিকাতা আসিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত (ইনি পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করিয়াছিলেন) 'উদ্বোধনে'র বাটীতে যাই। শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের পর উক্ত বন্ধুটি হঠাৎ আমার দীক্ষার কথা মায়ের নিকট উত্থাপন করেন। উত্তরে মা বলিলেন, "বেশ ত কালকে হবে।" হঠাৎ এ উত্তরে আমি প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম; কারণ আমি দীক্ষার কথা বলিতে তাঁহাকে বলি নাই এবং আমার মনেও দীক্ষার কথা উঠে নাই। যাহা হউক, পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় তথায় যাইলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "এখন নয়, আমি বলে দেব কখন দিতে হবে।" দীক্ষা হইয়া গেলে পর পা দুটি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "এখন দিতে পার।" পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমি অকপট ভাবে বলিলাম, "আমি যে ফুল দিয়ে পূজো করলুম এ আমার ভক্তি-বিশ্বাস
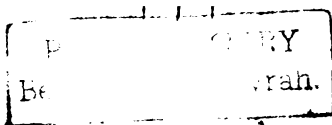
থেকে নয়, চন্দ্রকান্ত বাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ বলে দিয়েছেন তাই মাত্র করে গেলুম। চন্দ্রকান্ত বাবুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

শ্রীশ্রীমা সহাস্যে বলিলেন, "চন্দ্রকান্ত ত তোমায় ভাল পথই দেখিয়েছে, বাবা।" এই বলিয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিলেন।

* * *

ইহার পর একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, কথায় কথায় দুঃখ করিয়া মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাংসারিক নানা ঝঞ্চাট, তার উপর চাকরি আছে, কাজেই জপ-তপ আর হয়ে উঠে না। মনের উন্নতিও হচ্ছে না।" মা অভয় দিয়া অমনি বলিলেন, "এখন যাই হোক, শেষটায় ঠাকুরকে আসতেই হবে (তোমাদের নিতে)। তিনি নিজে বলে গেছেন; তাঁর মুখের কথা কি ব্যর্থ হতে পারে? যা প্রাণে আসে করে যাও।"

আমি—মা, যারা তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তাদের না-কি আর আসতে হবে না?

মা—না, তাদের আর আসতে হবে না। তোমরা সর্ব্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন।

আমি—মা, তোমায় পেয়েছি, এই আমাদের ভরসা।

মা—তোমার চিন্তা কি বাবা, তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়।

*　　　*　　　*

আর একবার কোয়ালপাড়া মঠে শ্রীশ্রীমার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।"

মা অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করবো।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার কিছু করতে হবে না?"

মা—না।

আমি—তবে এখন হতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজকৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না?

মা—না, তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করবো।

শ্রীশ্রীমায়ের এই অহেতুক কৃপায় আমি নির্ব্বাক হইলাম। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গে মায়ের পায়ের ব্যথার কথা উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনেছি কেউ কেউ পা ছুঁলে তোমার কষ্ট হয়, মা?"

মা—হ্যাঁ বাবা, কেউ কেউ ছুঁলে শরীরটি যেন শীতল হয়ে যায়, আবার এক একজন আছে ছুঁলে মনে হয় যেন বোলতায় কামড়ে দিলে। কাউকে কিছু বলি নি।

মনে মনে ভাবছি—তবে আমরাও কি ঐ বোলতা-শ্রেণীর? অন্তর্য্যামিনী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তোমরা নও।"

*　　　*　　　*

ইহার মাস খানেক পরে পুনরায় রথযাত্রার ছুটিতে কোয়ালপাড়া মঠে যাই। রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীমায়ের সহিত নিম্নলিখিত কথা হইয়াছিল :

আমি—মা, তোমার কৃপা পেয়েছি এই আমার বল-ভরসা।

মা—তোমার চিন্তা কি বাবা, তুমি আমার অন্তরে রয়েছ। কোন অভাব, প্রয়োজনে মনে চিন্তা এলে অমনি তোমাদের কথা মনে ওঠে—ইন্দু টিন্দু রয়েছে, ভাবনা কি? তোমার কিছু করতে হবে না। তোমার জন্যে আমিই করছি।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্যেই তোমার করতে হয়?"

মা—সকলের জন্যেই আমার করতে হয়।

আমি—তোমার এত ছেলে রয়েছে, সকলকে তোমার মনে পড়ে?

মা—না, সকলকে কিছু মনে আসে না।

আমি—তবে যে বললে, তুমি সকলের জন্যেই করে থাক?

মা—যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্যে জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্যে ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই কোরো।'

শ্রী—

শ্রীশ্রীমা যখন কোঠারে ছিলেন সেই সময় আমার মেজ দাদা আমাদের গ্রামবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধুকে ৺পুরীধাম 'শশি-নিকেতন' হইতে পত্রে জানাইলেন— "শ্রীশ্রীমা এখন কোঠারে আছেন, তোমরা তাঁহার দর্শনে যাইতে পার।" ইহার পূর্ব্বে একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না বা কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া অবধি আমার মন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দু-চার দিন এইরূপ ব্যাকুল হওয়ার পর তাঁহাকে দর্শন করিতে কোঠারে গেলাম। তথায় বেলা প্রায় বারটার পর পৌঁছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া আর আমার এতটা ব্যাকুলতা ছিল না। এই সময় ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার ডাক পড়ায় আমিও সেই সঙ্গে গেলাম। প্রসাদ পাইয়া পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ, কেদার বাবা ও আমরা বৈঠক-খানায় বসিয়া আছি, এমন সময় রাম বাবু (৺বলরাম বাবুর পুত্র) আসিয়া কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলিলেন, "যে ছেলেটি কটক থেকে এসেছে, মা তাকে ডাকছেন, সে এখন প্রণাম করে আসবে।" কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন, "তাকে আমি বলেছি, বিকেলে মাকে দর্শন করতে যাবে।"

রাম বাবু বলিলেন, "না, মা অপেক্ষা করছেন, দর্শন করে আসলে তিনি খেতে যাবেন।" আমি রাম বাবুর সঙ্গে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম, কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরদিন আমি বাড়ী চলিয়া আসি।

বাড়ী আসিয়া আবার মন ব্যাকুল হওয়ায় পুনরায় কোঠারে যাই এবং সেখানে তুই-চারি দিন থাকার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, কাল সকালে আমি বাড়ী যাব।"

মা বলিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকো, পরশু যেয়ো।" এই কথার পর আমি বাহিরে চলিয়া আসি। কিছুক্ষণ পর জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার উপর মায়ের দয়া হয়েছে, কাল সকাল বেলা স্নান করে প্রস্তুত থাকবে।" আমি ভাবিতেছি—'দয়া' কি? কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম। পরদিন সকালে স্নান করিয়া একা বসিয়া আছি এমন সময় রাধুদিদি আসিয়া বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ বাবু কে? তাঁকে মা ডাকছেন।"

আমি বলিলাম, "আমারই নাম বৈকুণ্ঠ। আমি মায়ের নিকট যাব?"

রাধুদিদির সম্মতি পাইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। মা দেখিয়া বলিলেন, "এস,

এ ঘরের ভিতরে এস।” পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি মন্ত্র নেবে?”

আমি বলিলাম, “আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দিন। আমি কিছু জানি না।”

মা বলিলেন, “বেশ, বস এখানে।”

মা—তুমি কোন্ দেবতার মন্ত্র নেবে?

আমি বলিলাম, “আমি কিছুই জানি না।”

তখন মা বলিলেন, “বেশ, তোমার ··· এই মন্ত্রই ভাল।” মায়ের নিকট আমি সেই দিনই দীক্ষিত হইলাম—১৩১৭ সালের মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে। এইখানেই একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মা, যোগ-শিক্ষার জন্য অন্য গুরু করতে পারা যায় কি-না?” উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, “অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য তুমি গুরু করতে পার, কিন্তু দীক্ষাগুরু আর করতে নেই।”

যে দিন কোঠার হইতে রওনা হইব তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রায় বারটার সময় রাম বাবু কিছু মিষ্টি হাতে লইয়া আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিলেন, “বৈকুণ্ঠ, মা এই মিষ্টি দিয়েছেন, তুমি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। রাস্তার কোন বাজারে খাবার কিনে খেতে মা নিষেধ করলেন।”

* * *

আর একবার আমি একাকী শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে

গিয়াছিলাম। মা তখন কয়েকদিনের জন্য জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন। আমারও কামারপুকুরে এই প্রথম যাওয়া। শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা ও লক্ষ্মীদিদি তখন কামারপুকুরে। প্রথম দিন রামলাল দাদা ও আমি বারান্দায় খাইতে বসিয়াছি, মা মাঝে মাঝে আমাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলিন এবং আমাকে বলিতেছিলেন, "বৈকুণ্ঠ, সমস্ত খেয়ো, পাতে কিছু ফেলো না।" এই কথা বলিতে বলিতে আরো জিনিস আমার পাতে দিতে লাগিলেন। রামলাল দাদাও "আরো খাও, লজ্জা কোরো না"—এইরূপ বলিতেছিলেন। তখন আমি এত খেয়েছি যে পেটে আর ধরে না, অথচ সঙ্কোচবশতঃ কিছু বলিতেও পারিতেছি না। রামলাল দাদার এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "থাক্, ও ক্ষ্যাপা ছেলে, যা খেয়েছে—খেয়েছে, আর কিছু বোলো না" এবং আমাকে বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, এখন পাতা গ্লাস বাটি উঠিয়ে নিয়ে যাও, গুরুগৃহে* ওসব রেখে যেতে নেই।"

---

* এখানে গুরুগৃহ বলিতে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ, তিনি নিজে এই সব ভক্তদের গুরু হইলেও জয়রামবাটী-অবস্থানকালে কখনও তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট ফেলিতে দিতেন না। ঝি-চাকর দ্বারা পরিষ্কার করাইতেন, অনেক সময় নিজেই করিতেন—গুরু হইলেও তিনি যে 'মা'; তবে উচ্ছিষ্ট পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে অসুবিধা করবে বলে কখনো কখনো ভক্তেরা শুধু পাতাটা তুলে নিয়ে যেতেন।

দ্বিতীয় দিন যখন প্রণাম করিতে যাই তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাড়ী যাচ্ছ কবে?"

আমি বলিলাম, "মা, আমি বেলুড় মঠ দেখি নাই, মঠ হয়ে পরে বাড়ী যাব।"

তাহাতে মা বলিলেন, "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, তুমি আজই বাড়ী যাও।"

আমি বলিলাম, "মা, এতদূর এসেছি। একবার মঠে না গিয়ে এখন বাড়ী ফিরছি না।"

মা বলিলেন, "না, তুমি বাড়ী যাও, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নেই।" এই কথার পর আমি আর কোন আপত্তি করিলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া রাখিলাম, এখান হইতে সরিতে পারিলেই মঠে যাইব, তখন আর মা জানিতেও পারিবেন না। সেই সময় এলাহাবাদ হইতে একটি স্ত্রী-ভক্ত ও তাঁহার সঙ্গে একটি পুরুষ-ভক্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মা সেইদিনই দীক্ষা দিলেন। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এদের সঙ্গে যাও।" কিন্তু আমি সঙ্গে যাইলে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে বলায় আমি আর গেলাম না। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য মা সদর-দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আমি আমার টাকার ব্যাগটি সদরের কুলুঙ্গিতে রাখিয়াছিলাম। উক্ত কুলুঙ্গিতে মায়ের

দৃষ্টি পড়ায় তিনি উহা ঘরে রাখিয়াছিলেন। তার-পর লক্ষ্মীদিদিকে দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "বৈকুণ্ঠ তার টাকার ব্যাগ কি করলে?" এই কথা শুনিয়া আমি সেখানে খুঁজিতে যাইয়া উহা পাইলাম না দেখিয়া লক্ষ্মীদিদি গিয়া মাকে এই সংবাদ জানাইলেন। মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এত অসাবধান হলে কি সংসার চলে? এইটুকু সাবধানতা যার নেই, সে আবার কিসের সংসার করবে? তোমার টাকার ব্যাগ আমার কাছে আছে। তুমি তাদের সঙ্গে গেলে না কেন?" আমি কারণ বলায় মা তাঁহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। আমি মাকে বলিলাম, "আপনি সেজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি একটা লোক ঠিক করে কাল যাব।" মা এই কথা শুনিয়া নিজের ঘরে গেলেন।

সেইদিন দুপুরবেলা আমাকে ভিতরে ডাকাইয়া বলিলেন, "এ চিঠিগুলি খুলে পড় দেখি, কি সংবাদ আছে।" আমি চিঠিগুলি পড়িলাম। তন্মধ্যে এক-খানির কথা বিশেষ মনে আছে—বাগবাজার মঠ হইতে আসিয়াছে, এই মর্ম্মে লিখা ছিল যে, পূজনীয় শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একবার দেখিতে চান এবং মা তাঁহাকে যে চিকিৎসায় থাকিতে বলিবেন, তিনি সেই

চিকিৎসাতেই থাকিতে চান। মা চিঠি শুনিয়া বলিলেন, "আমি আর কি চিকিৎসার কথা বলবো। শরৎ, রাখাল, বাবুরাম আছে, তারা পরামর্শ করে যেটি ভাল মনে করে তাই করুক। আমি সেখানে গেলে তো রোগীকে সরাতে হবে। সেটা কি ভাল হবে? এমন রোগীকে কি সরাতে আছে? আমি যাব না। যদি শশীর কিছু ভালমন্দ হয়, তখে কি আমি সেখানে থাকতে পারবো? তুমি বুঝিয়ে লিখে দাও তো—আমি এই জন্য যাব না।"

পরদিন প্রসাদ পাওয়ার পর বাড়ী রওনা হইবার জন্য বিদায় লইতে বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি—মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় পান সাজিতেছেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুবীরকে প্রণাম করেছ?"

আমি বলিলাম, "না, মা।" তাহাতে মা বলিলেন, "এখানে এলে কিছু দিতে হয়, তুমি রঘুবীরকে প্রণাম করে কিছু প্রণামী দিও। তোমার কাছে যদি টাকাপয়সা না থাকে, আমার কাছ থেকে নিও।"

আমি বলিলাম, "না, আমার কাছে টাকা আছে।" এই বলিয়া রঘুবীরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার জন্য মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস্।" এই কথার পরমুহূর্তেই আবার বলিলেন, "ঠাকুরকে

ডেকো, ঠাকুরকে ডাক্‌লেই সব হবে।” এই সময় লক্ষ্মীদিদি সেখানে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মা, মা, একি কথা? এ-তো বড় অন্যায়! ছেলেদের এমন করে ভুলালে তারা কি কর্‌বে?”

মা বলিলেন, “কই, আমি কি করলুম?”

লক্ষ্মীদিদি—মা, তুমি এই মুহূর্ত্তে বৈকুণ্ঠকে বল্‌লে, ‘আমায় ডাকিস্’, আবার বল্‌ছ ‘ঠাকুরকে ডেকো’।

মা বলিলেন, “ঠাকুরকে ডাক্‌লেই তো সব হ’ল।” তখন লক্ষ্মীদিদি মাকে বলিলেন, “মা, এরকম ভাবে ভুলানো তোমার অন্যায়।” আর আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, “দেখ, বৈকুণ্ঠ, আমি আজ এই নূতন শুনলুম যে, মা বলেছেন—‘আমায় ডেকো’। তুমি একথা যেন ভুলো না। ঠাকুর আর কে? তুমি মাকেই ডেকো। তোমার বড় ভাগ্য যে মা নিজে তোমায় একথা বললেন। তুমি মাকেই ডেকো।” আমাকে এইরূপ বলিয়া মাকে বলিলেন, “কেমন মা, হয়েছে এখন?” লক্ষ্মীদিদির এই কথায় মা মৌন রহিয়া সম্মতির লক্ষণ জানাইয়াছিলেন।

আসিবার সময় মা আবার আমাকে বলিলেন, “তুমি এখান থেকে একেবারে ঘরে যেয়ো, এখন মঠে বা এখানে ওখানে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ঘরে গিয়ে

বাপমায়ের সেবা কর। এখন বাবার সেবা করা উচিত।" এই কথা বলিয়া আমার হাতে চার খিলি পান দিয়া আমাকে আসিতে বলিলেন। আমিও মার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোয়ালপাড়া মঠ হইয়া বাড়ী আসিলাম। যাইবার সময় বাবার শরীর ভাল দেখিয়া গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি—বাবার বড়ই শক্ত ব্যারাম হইয়াছে। আমার পৌঁছিবার ছয়-সাত দিন পরেই বাবা দেহরক্ষা করিলেন।

এবার কামারপুকুর যাইবার সময় আমার এক গুরুভাই আমার হাতে মায়ের নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মাকে দিবার সময় মা বলিলেন, "তুমি খুলে পড়।" তাতে নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্ন ছিল: (১) আমি চাকরি করিতে যাইতেছি, চাকরি করিলে মায়ায় জড়াইব কি, মা? শুনিয়া মা বলিলেন, "চাকরি করলে আবার মায়ায় কি জড়াবে?" (২) বিবাহ করিলে আমার ভাল হবে কি-না? মা এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি বিয়ে করেছ কি?" আমি বলিলাম, "না মা, আমি বিবাহ করি নাই।" শুনিয়া বলিলেন, "বেশ তো, তুমি বিয়ে করো না, বিয়ে করা বড় জঞ্জাল।"

কামারপুকুরে অবস্থানকালে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, মাছমাংস খেলে দোষ কি?" তদুত্তরে মা বলিলেন, "এ দেশ মাছের দেশ, মাছ খেতে পার।"

সেই সময় আমি একবার মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, আপনার পদ-চিহ্ন নিতে চাই।" তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "এখন এখানে সুবিধা নয়। তোমরা আমাকে যেমন (যে চক্ষে) দেখ, সকলে তো তেমন দেখে না। এই লাহাবাবুদের বাড়ীর অনেকে এখানে আসে টাসে। সে জন্যে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে—পায়ে আলতার চিহ্ন থাকবে কি-না।"

*　　　*　　　*

অন্য এক সময় আমাদের দেশের কয়েকটি গুরু-ভাই মিলিয়া জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছিল যে 'এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছি। জীবনে তো কিছুই করিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীমায়ের যদি সেবা করিতে পারিতাম, নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করিতাম।' একদিন সব গুরুভাইরা কামার-পুকুর গেলেন। আমি কিন্তু গেলাম না। বৈকালে মায়ের কাছে গিয়াছি। তিনি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় (নূতন বাড়ীতে) বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া

বলিলেন, "বাবা, ভাঁড়ার থেকে আটার হাঁড়িটা নিয়ে এস তো।" আমি আনিয়া দিলাম। তিনি খানিকটা আটা বাহির করিয়া জল মাখিলেন এবং উহা ঠাসিতে বলিলেন। আমি আটা ঠাসিয়া দিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম। পুনরায় সন্ধ্যার সময় মায়ের কাছে গিয়াছি, তখন মা তাঁহার নিজের ঘরের বারান্দায় বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। আমি তথায় বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, পা-টা একটু টিপে দাও তো বাবা।" আমি পা টিপ্‌ছি, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেরা কামারপুকুর থেকে এখনো এল না কেন? রাস্তা-টাস্তা ভুলে গেল নাকি?" এই কথা বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডাকিয়া বলিলেন, "জ্ঞান, একবার দেখ তো, ওদের এত দেরি কেন হচ্ছে?" ব্রহ্মচারী জ্ঞান দেখিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সেদিন রাস্তা ভুল হইয়াছিল। খোঁজ না লইলে তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছিতে আরো অনেক দেরি হইত।

রাত্রিতে আমরা সকলে মায়ের সদর-ঘরের বারান্দায় ঘুমাইয়াছিলাম। শেষরাত্রে চারটার সময় আমাদের সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। একজন বলিলেন, "এই সন্ধিক্ষণে যদি একবার মায়ের দর্শন মিলতো!" এই বলিয়া তিনি

একটি গান ধরিলেন—"ওঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটীরদ্বার" ইত্যাদি। গান শেষ হইতেই দেখি, মা বাহির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা হঠাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়া মহানন্দে একে একে সকলে প্রণাম করিলাম। মা আবার দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গেলেন।

* * *

আর একদিন আমরা কয়েকজন মিলিয়া ৺বাসন্তী পূজার সময় জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। রাস্তায় সাদা পদ্মফুল দেখিতে পাইয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম। যখন আমরা ঐ ফুল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় মা বলিয়া পাঠাইলেন, "দেবীর পূজাতে সাদা ফুল লাগে না।" এ সংবাদ পাইয়া আমরা পুনরায় লালপদ্ম সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়াছিলাম।

একদিন তাঁহার সাংসারিক্ কোন কথায় শুনিলাম—মা যেন কাহাকে বলিতেছেন, "আমাকে বেশী জ্বালাবে না, কারণ আমি যদি চটেমটে কাউকে কিছু বলে ফেলি তো কারো সাধ্য নেই যে আর রক্ষা করে।"

সেবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে

রাখছে, এর পরিণাম কি হবে?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "তাই তো বড় অন্যায়। এর একটা প্রতীকার শীঘ্র হবে। আর বেশী দিন নয়—ভাল হবে।"

একদিন আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমার একটা কিছু করে দিন।" তাহাতে মা বলিলেন, "শরৎ, রাখাল এরা রয়েছে, ভয় কি?" তখন আমি বলিয়াছিলাম, "মা, আমার বড়ই ইচ্ছা হয় কিছুদিন মঠে গিয়ে থাকি।" মায়ের মত হইল না, বলিলেন, "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ীতেই থাকো।"

এবার আমাদের গ্রামের ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর মুখে শুনিয়াছি —দীক্ষার সময় মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আজ থেকে তোমার ইহকাল ও পরকালের পাপ গেল।"

* * *

একদিন কলকাতায় বাগবাজারে মায়ের বাটীতে (উদ্বোধন কার্য্যালয়ে) মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মশায়কে প্রণাম করেছো?"

আমি বলিলাম, "না মা, আমি তাঁকে চিনি না।"

মা বলিলেন, "যাও, নীচে সে আছে। সে মহাপুরুষ লোক, তাকে প্রণাম করে এস।" এই বলিয়া

পূজনীয়া গোলাপ-মাকে আমার সঙ্গে পাঠাইলেন মাষ্টার মহাশয়কে চিনাইয়া দিতে। আমি নীচে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আবার উপরে গেলাম। দুইজন লোক এই সময় মাকে প্রণাম করিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। মা ঠাকুরঘরে নিজ তক্তাপোশে বসিয়াছিলেন। তিনি আপনমনে বলিতেছিলেন, "যে-সে লোক পা ছুঁয়ে বড় যন্ত্রণা দিলে!"

* * *

একবার কোন বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে আমার সঙ্গে মেজদাদার ঝগড়া হওয়ায় আমি কিছুদিনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা করিয়া ঐ বিষয় শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে এবং তাঁহার অনুমতি লইতে বাগ-বাজার গিয়াছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মা গোলাপ-মাকে বলিতেছেন, "ও গোলাপ, শুনেছ, বৈকুণ্ঠকে তার দাদা একটা চড় মেরেছে বলে সে এতদূর ছুটে এসেছে! ঘর করলে কি ঝগড়া হয় না? তার জন্যে এতটা কেন?" আমাকে বলিলেন, "যাও বাবা, বাড়ী যাও। ঘর করলে একটু আধটু ঝগড়া হয় বই কি।"

* * *

আমার এক গুরুভাই ঠাকুরের গায়ত্রী মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া আমাকে উক্ত মন্ত্র জিজ্ঞাসা করায় আমি মাকে

চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মন্ত্র কাহাকেও বলা যায় কি-না।" মা তখন মাদ্রাজে। তদুত্তরে চিঠিতে মা আমাকে জানাইয়াছিলেন, "মন্ত্র কাহারও নিকট বলিতে নাই, তবে তোমার গুরুভায়ের নিকট বলিতে পার, তাহাতে দোষ নাই।"

*　　　*　　　*

একদিন মনের দুঃখে বাগবাজারে 'উদ্বোধন'-এর বাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলাম, "মা, আমি আপনার নিকট কিছু বলতে এসেছি।"

মা—কি, বল।

আমি—মা, কবে আপনার এ অভাগা ছেলেকে দয়া হবে?

মা—বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন, তাঁকে ডাকো। আর সৎসঙ্গ কর, সাধনভজন কর। ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।

আমি—ঐ করে তো মা কিছু হল না। আমি ঠাকুরকে দেখি নি—কি ডাকবো? আপনার দয়া পেয়েছি। যদি আপনি বলছেন, তবে আপনার এ অভাগা ছেলের জন্যে আপনি-ই তাঁকে বলুন।

মা—জপ-ধ্যান না করলে কি হয়? সে-সব যে করতে হয়।

আমি—আর আমার জপটপ করতে মা ইচ্ছে নেই। করে তো কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটে নাই।

মা—বাবা, মন্ত্রজপ করতে করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখন সময় পাবে, মন্ত্রজপ কোরো। ঠাকুরকে ডেকো।

আমি—না মা, আমার সে ক্ষমতা নেই। জপ করতে বসি তো মন চঞ্চল। হয়—আমার মন তন্ময় করে দিন যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, না হয়—আপনার মন্ত্র আপনি ফেরৎ নিন। বৃথা আপনাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে নেই। কারণ, শুনেছি—শিষ্য মন্ত্রজপ না করলে সেজন্য গুরুকেই ভুগতে হয়।

মা—দেখ, একি কথা। তোমাদের জন্যে যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোদের যে কবে (অর্থাৎ পূর্ব্বেই) দয়া করেছেন।

এই কথা বলিতে বলিতে মার চোখে জল আসিল। আবেগভরে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্রজপ করতে হবে না।"—অর্থাৎ যা হয় তিনি নিজেই আমার জন্য করিবেন।

কিন্তু তখন তাঁহার কথার এই মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া

ভয় ও আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে ; ভাবিলাম —সব সম্বন্ধ বুঝি ফুরাইল। প্রাণের আবেগে বলিলাম, "মা, আমার সব কেড়ে নিলেন। এখন আমি করি কি? তবে কি, মা, আমি রসাতলে গেলুম?"

এই কথা শুনিয়া মা খুব জোরের সহিত বলিলেন, "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।"

আমি—তবে মা এখন কি করবো?

মা—আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্ব্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

আমি—মা, যতক্ষণ আপনার নিকট থাকি, খুব ভাল থাকি। সংসারের কোন চিন্তা আমার থাকে না। আর যেমন বাড়ী যাই, অমনি মনে নানা কুচিন্তা আসে। আবার সেই পুরানো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, আর অন্যায় কাজ করি। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই কুচিন্তা দূর করতে পারি না।

মা—ও তোমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে। জোর করে (হঠাৎ) কি ও ছাড়া যায়? সৎসঙ্গে মেশো, ভাল

হতে চেষ্টা কর, ক্রমে সব হবে। ঠাকুরকে তা
রইলুম। তুমি এ জনমে মুক্ত হয়ে রয়েছ,
ভয় কি? সময় আসলে তিনিই সব করে দেবে

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি ইংরেজী ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় উড়িষ্যার কোঠারে*। আমার সহিত হেমন্ত মিত্র ও বীরেন্দ্র মজুমদার নামক আরও দুইজন ভক্ত শিলং হইতে আসিয়াছিলেন। কোঠারে তখন রামকৃষ্ণ বাবু, স্বামী ধীরানন্দজী, স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। আমরা কিছু ফল ও কমলা-মধু প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় পৌঁছিলাম। জিনিসপত্র রামকৃষ্ণ বাবু শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। স্নানান্তে আমাদিগকে আহার করিতে ডাকা হইল। ইতোমধ্যে উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'যখন এত দূর দেশ হতে এসেছে, মাকে দর্শন করতে দিতেই হবে—তবে বেশী কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে না।' বীরেনবাবু শুনিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে

---

* কোঠার—শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ৺বলরাম বসুর জমিদারী। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীশ্রীমাকে কিছুদিন তথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মা এখান হতেই পরে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিতে গিয়েছিলেন।

বলিলাম, “মার যা ইচ্ছা তাই হবে—ভয় কি?” সকলেই আহার করিতে গেলেন। আমি রামকৃষ্ণ বাবুকে বলিলাম, “মাকে দর্শন না করে আমরা কিছু খাব না।” রামকৃষ্ণ বাবু শ্রীশ্রীমাকে ঐ কথা জানাইলেন এবং আমাদের দর্শনের অনুমতি লইয়া আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—মা বারান্দায় রীতিমত ঘোমটা টানিয়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। নিকটে যাইতেই গোলাপ-মা বলিলেন, “ছেলেমানুষ গো, ছেলেমানুষ; মা, কোথায় শিলং আর কোথায় কোঠার, তোমাকে দেখতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছে!” এ কথা শুনিয়াই মা ঘোমটা টানিয়া মাথার উপর উঠাইলেন, মায়ের শ্রীমূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। সেইদিন হইতে মা আর কখনো আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দেন নাই। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে ‘শরণাগত শরণাগত’ এই কথা বলিলাম। মা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—“ভক্তিলাভ হোক।”

আমি—মা, এখানে দু’-এক দিন থাকবো ইচ্ছা। বড় মানুষের বাড়ী, তোমাকে দর্শন করা বড়ই মুশকিল।

মা—আমি তোমাদিগকে ডেকে পাঠাব। এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করগে।

আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে পূজনীয়া গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী পায়েস একটি বাটিতে আমাদের দিয়া গেলেন; বলিলেন, "মা তোমাদের এই পায়েস দিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া বলিলেন, "মা আপনাদের ডেকেছেন।" আমরা পুনর্ব্বার দর্শন পাইলাম। প্রণামান্তে মাকে বলিলাম, "মা, তোমাকে দু'-একটি কথা বলবো, তা সকলের সামনে বলতে ইচ্ছে হয় না।"

মা বলিলেন, "বেশ ত।" যিনি আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি একটু এখান থেকে যাও।" তিনি মায়ের কথামত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শনাদি করিয়াছিলাম, সেই সকল কথা বলিলাম। মা ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক দেখেছ।" অপর ভক্ত দুইটি সম্বন্ধে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদের কি ইচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কাছে এসেছে দীক্ষার জন্যে, এখন তোমার যা ইচ্ছা।"

মা—বেশ, কাল সকালে স্নান করে এস।

আমি—মা, ঠাকুর তোমার পাদপদ্ম পূজা করেছিলেন, আমাদেরও ইচ্ছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোমার পাদপদ্ম পূজা করবো।

মা—আচ্ছা, তাই হবে।

আমি—ফুল কোথায় পাব?

মা—এরা যোগাড় করে দেবে।

আমরা প্রণাম করিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম।

শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁদের কি ইচ্ছে?" কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিলেন না। মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আমার একটু চিন্তা হইল, ভাবিলাম—মায়ের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি নিজে কিছু বলিব না।

পরদিন আমরা স্নান করিয়া পুষ্পাদিসহ প্রস্তুত হইলাম। আদেশ হইল—'এক একজন করিয়া এস।' আমিই প্রথম গেলাম। মা পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বসিয়া আছেন—মনে হইল। আমি প্রবেশ করিলে বলিলেন, "ঠাকুর তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তুমি করবে। আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি।" এই বলিয়া মহামন্ত্র দিলেন।

পরে শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলাম। মা দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। আমি বলিলাম, "মা, আমি তো

মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না।" মা বলিলেন, "অমনিই দাও না।" আমি 'জয় মা' বলিয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। একটি ধুতুরা ফুল ছিল—মা বলিলেন, "ওটি দিও না—ও শিবের পূজোয় লাগে।"

মায়ের জন্য কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম, সেই কাপড়-খানি আর একটি টাকাও দিলাম। টাকা দেওয়াতে মা বলিলেন, "তোমার টানাটানি, অভাব—আবার টাকা কেন?" সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে তো কোন কথাই হয় নাই, অথচ দেখিলাম মা সবই জানেন! আমি বলিলাম, "এ-তো তোমারই টাকা, তোমাকেই দেওয়া হচ্ছে; আমাদের পরিশ্রমে যা কিছু আসে, তার সামান্যও যদি তোমার সেবায় লাগে, আমরা ধন্য মনে করি।"

মা বলিলেন, "আহা! কি টান গো, কি টান!"

আমি—মা, তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী এসব বলেন। গীতায় আছে, 'অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলেছিলেন; স্বয়ং তিনিও একথা অর্জ্জুনকে বলেছিলেন।' * এই 'স্বয়ং' বলায় ঐ কথার আরও

* আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

জোর হয়েছে। তোমার কথা যা শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তা হলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই ও কথা সত্য কি-না।

মা—হ্যাঁ, সত্য।

ইহার পর ভবিষ্যতে আর কোন দিনই মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন করি নাই।

আমি বলিলাম, "মা, আমি এই চাই—যেমন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, কথাবার্ত্তা বলছি, আমি যেন এইরূপই ইষ্টকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপ করতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ কর।"

মা—হ্যাঁ, তাই হবে।

তার পরদিন বিদায়গ্রহণের সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মায়ের বড়ই প্রসন্ন মূর্ত্তি ও হাসিমাখা মুখ দেখিলাম। গোলাপ-মা আমাকে বলিলেন, "পুরীধাম দর্শন করে যাও না।" আমি বলিলাম, "আর কি দেখব? মায়ের পাদপদ্মই আমার অনন্তকোটী তীর্থ। আর কিছুই চাই না।"

মা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "থাকগে, নাই বা গেল, দরকার নেই।"

*　　*　　*

দ্বিতীয় দর্শন—১৯১২ সনের মে মাসে 'উদ্বোধন'-এর বাটীতে। এবারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও আমার সহধর্ম্মিণীর দীক্ষা হয়। শ্রীমতী রাধুর অসুখ থাকায় বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমার গর্ভধারিণী ও মাতামহী আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার ছুটি ছেলেও ঐ সঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহারাও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন, স্পর্শন করিয়া ধন্য হইলেন।

* * *

তার পর দর্শন—জয়রামবাটীতে ১৯১৩ সনে; শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের বিবাহের তিন-চার দিন পূর্ব্বে। সেবারে কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিয়া শুনিলাম—সম্প্রতি একটি ভক্ত* শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় উক্ত মঠে দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। কেশবানন্দজী বলিলেন, "এখন জয়রামবাটী যাওয়া মার নিষেধ—বড্ড গরম পড়েছে, বৃষ্টি না হলে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না।" একটু চিন্তিত হইলাম—এতদূর আসিয়াছি, মায়ের নিষেধ ঠেলিয়া কেমন করিয়া যাই। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের কৃপায় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলাম।

* ৺দ্বারকানাথ মজুমদার।

কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে মা বলিলেন, "বাবা, কাল বেশ বৃষ্টি হয়েছে—আজ বেশ একটু ঠাণ্ডা।" পরলোকগত ভক্তটির কথা তুলিয়া মা বলিলেন, "সাধুর যা মৃত্যু, তা ওর হয়েছে ; আমি তাকে এখনো দেখছি। তবে ওর বুড়ো বাপ আছে, তার জন্যই কষ্ট হয়।" এই বলিয়া মা অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কাশীধাম হইতে ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্রনাথ এই সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হন। উক্ত ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন—বলিতেন। চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি না-কি পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার গুরু ছিলাম।" আমি কিন্তু কিছুই জানি না। তাঁহার এবম্বিধ সকল কথাই পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমরা দুইজন একত্র হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেই মা আপনা হইতে বলিলেন, "তোমরা দুজন এক জায়গায় ছিলে, আবার ঠিক এক জায়গায় এসেছ।"

ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র চুপি চুপি আমাকে বলিলেন, "কেমন, আমি যা বলেছিলুম, মায়ের কথায় বুঝলেন তো যে তা ঠিক ঠিক।"

আমি—হবে, আমি তো কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্র

আমাকে বলিলেন, "আমি মার কাছে সন্ন্যাস নিতে এসেছি, কিন্তু যতক্ষণ আপনি মাকে সে বিষয়ে অনুরোধ না করবেন, ততক্ষণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। ঠাকুরের ইচ্ছায়ই আমি এ সময়ে এসেছি। আপনি না বললে হবে না বলেই ঠাকুর আমাকে এ সময়ে উপস্থিত করিয়েছেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে কাশীতে প্রত্যক্ষ দর্শন করে এসেছি, কথাবার্ত্তাও হয়েছিল—এ সব সত্য কথা।"

আমি বলিলাম, "আমি সহজে বলবো না—দেখি কি হয়।"

দেবেন্দ্র—কিছুতেই হবে না।

আমরা সাত-আট দিন ছিলাম। দেবেন্দ্র ইতোমধ্যে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। আমারও উহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল। যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমি একাকী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "মা, তোমাকে একটা কথা বলবো।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটু পরে এস, যখন আমি তরকারি কুটতে বসবো তখন।"

কিছুক্ষণ পরে মা তরকারি কুটিতে বসিলেন এবং আমি উপস্থিত হইলে বলিলেন, "তুমি কি বলবে, এখন বল।"

আমি বলিলাম, "মা, তুমি ত সবই জান—কাশীতে দেবেন্দ্রকে দেখাও দিয়েছ, ঠাকুরও দর্শন দিয়েছেন। এখন তার ইচ্ছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সে তো আর সংসার করবে না—তবে দাও না কেন?"

শুনিয়া মা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও যদি সন্ন্যাস নেয় তবে কি কারো কোন কষ্ট হবে না?

আমি—তার বাপ মা কেউ জীবিত নেই। এক বড় ভাই আছে সে ব্রাহ্ম এবং উপার্জ্জনক্ষম। কারো যে কোন কষ্ট হবে এমন তো দেখি নে।

মা—আচ্ছা, তবে হবে। কোয়ালপাড়া থেকে নূতন কাপড় গেরুয়া রং-এ ছুপিয়ে আনবে। কালই হবে।

আমি আসিয়া দেবেন্দ্রকে সব বলিলাম। শুনিয়া দেবেন্দ্রের খুব আনন্দ—সকল জিনিস যোগাড় করা হইল।

পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া মা পূজাদি করিলেন এবং দেবেন্দ্রকে গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন দিয়া বাহিরে যাইয়া পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি তখনো শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বসিয়া। আমার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম এমন সময় মা যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়াই সস্নেহে বলিলেন, "বাবা, ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ খাবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ মা, দাও।"

মা সরবৎ লইয়া নিজে একটু পান করিয়া সরবতের গ্লাসটি সযত্নে আমার হাতে দিলেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী সরবৎ পান করিয়া ধন্য হইলাম, মনে হইল— 'এর কাছে আবার সন্ন্যাস কি? এ যে দেব-দুর্লভ।' এক আশ্চর্য্য ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল।

দেবেন্দ্র গেরুয়া কাপড় পরিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা আমাকে বলিলেন, "দেখছ, যেন আর একটি হয়েছে, সে মানুষ আর নেই।"

কালী মামা (শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যম ভ্রাতা, ভূদেবের পিতা) আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমি যাহাতে ভূদেবের বিবাহে যাই—কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা মায়ের নিকটেই থাকি। ভাব বুঝিয়াই মা বলিলেন, "না, ওর গিয়ে কাজ নেই, ও এখানেই থাকবে।"

বিবাহোপলক্ষে পাচক ব্রাহ্মণেরা রান্না করিতেছিল। দেবেন্দ্র ও আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। তাহা দেখিয়া মা উহাদের বলিলেন, "এদের গলায় একটা পৈতে নেই—তাই ভাবছ এরা ছোট। আহা, এদের তুল্য কি আছে?"

বিবাহে খেলুড়েদের একজন বুকে পাথর ভাঙ্গিয়া খেলা দেখাইয়াছিল। ভাঙ্গিবার সময় মা কেবল বলিতে-

ছিলেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর; ঠাকুর, রক্ষা কর।" পাথর ভাঙ্গা হইয়া গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ওরা কি মন্তর-টন্তর জানে?"

আমি—না মা, মন্তর-টন্তর কিছু নয়; এই রকম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করেছে। আমি একটা গল্প শুনেছি—আমেরিকার কোন সাহেব একটি বাছুরকে প্রত্যহ কোলে করে দূরে গোচারণের মাঠে নিয়ে যেতো। ক্রমশঃ বাছুরটি বড় হয়ে ষাঁড় হল। তখনও সে কোলে করে নিতে পারতো, আর সকলকে এই খেলা দেখাতো। এ সবই অভ্যাসের কাজ।

মা—বটে, দেখলে অভ্যাসের কত শক্তি! এমনি, জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ।

নাগমহাশয়ের জীবনচরিতে আছে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং প্রসাদ করিয়া নিজ হাতে নাগ মহাশয়কে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল—বাপের চেয়ে মা দয়াল!" ইহা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল—'মা কি আমাকে তেমনি করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন? একথা কিন্তু মাকে বলা হবে না, তিনি নিজে দয়া করিয়া দেন তো হবে।'

আশ্চর্য্য, সত্যসত্যই একদিন তিনি আমায় ঐরূপে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন।

এই সময় জয়রামবাটীতে একটি সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণমঠের নহেন, কিন্তু দেখিলাম শ্রীশ্রীমায়ের পরিচিত। একদিন সকালে খাইতে বসিয়াছি, উক্ত সন্ন্যাসীও পাশে একটু দূরে বসিয়াছেন। মা আমাকে বলিলেন, "বাবা, গেরুয়া কি নিলেই হল? (উক্ত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) ঐ দেখ না গেরুয়া নিয়েছে!"

আমাকে বলিলেন, "তোমার এমনিই সব হবে, গেরুয়ার দরকার কি?"

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একজোড়া কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম। মাকে বলিলাম, "মা, শুনেছি তুমি কাপড় সকলকে বিলিয়ে দাও। তুমি যদি নিজে কাপড় দুখানি পর তবে আমার খুব আনন্দ হয়।" শুনিয়া মা কিছু বলিলেন না—একটু হাসিলেন। পরদিন আমি যাইতেই বলিলেন, "এই দেখ বাবা, তুমি যে কাপড় এনেছো তা পরেছি।"

আমার প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমাকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাপড় দিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় ময়লা, তুমি ধুইয়ে নিও।"

আমি বলিলাম, "না মা, তুমি যেমনটি দিয়েছ, ঠিক তেমনই রাখতে ইচ্ছা, ধোপার ঘরে দেওয়া হবে না।"

মা—আচ্ছা, সেই ভাল।

একদিন মা খাইতে বসিয়াছেন। আমি ও দেবেন্দ্র এমন সময় সেখানে উপস্থিত হইলাম। মা বলিলেন, "প্রসাদ নেবে?" আমরা উভয়ে হাত পাতিলাম। নিজ-মুখে একটু দিয়া আমাদের হাতে প্রসাদ দিলেন। হাত হইতে পড়িয়া যায় দেখিয়া নিজেই বেশ করিয়া চাপিয়া দিলেন। মায়ের ব্রাহ্মণ শরীর, আমি কায়স্থ—কোন বর্ণবিচার নাই, আমার হাতে দিলেন। পরে নিজে খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের দেখিতেন—ঠিক যেন নিজের ছেলে।

শ্রীশ্রীমাকে যখনই দর্শন করিতে যাইতাম, কিছু ফল কি অন্য জিনিস যাহা সুবিধা হইত লইয়া যাইতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মা সকলের জিনিস ঠাকুরকে দিতে পারেন না। এ জন্য অনেক সময় মনে ভয় হইত—'কি জানি, আমরা তো ভাল মানুষ নই, মা গ্রহণ করিতে পারেন কি-না, কে জানে!' মা কিন্তু প্রায়ই বলিতেন, "বাবা, তুমি যে অমুক জিনিস এনেছিলে, ঠাকুরকে দিয়েছি, বেশ জিনিস, বেশ মিষ্টি—আমি খেয়েছি।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ভগবানের নাম করলেও কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না ?"

মা বলিলেন, "প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।"

মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাধন-ভজন ত কিছুই করতে পারি না, আর কখনো যে কিছু করতে পারবো এমনও মনে হয় না।"

মা ভরসা দিয়া বলিলেন, "কি আর করবে, যা করছ তাই করে যাও। মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে ঠাকুর আছেন—আমি আছি।"

রাধু একদিন অসুখে একটু ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। মা বলিলেন, "দেখ ত বাবা, ওর কি হয়েছে ?" আমার কোন নাড়ী-জ্ঞান নাই, তবু মাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি রাধুর নাড়ী টিপিয়া বলিলাম, "বিশেষ কিছু নয়, একটু দুর্ব্বল হয়েছে। একটু দুধ খাইয়ে দাও।" মায়ের ছেলেমানুষের মত স্বভাব—তখনি দুধ খাওয়াইতে বসিলেন। একটু পরে রাধুর মা আসিয়া রাধুর নিকটে বসিলেন। তাহাতে রাধু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তাহার ইচ্ছা নয় যে তাহার গর্ভধারিণী নিকটে থাকেন। মা

রাধুর মাকে একটু সরাইয়া দিবার ইচ্ছায় হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাও না।" উহাতে হঠাৎ শ্রীশ্রীমায়ের হাত রাধুর মায়ের পায়ে ঠেকিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে? আমার কি হবে গো!" তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া মায়ের হাসি আর থামে না। রাস-বিহারী দাদা নিকটে ছিলেন; বলিলেন, "মা, দেখেছ এদিকে পাগলী তোমাকে এত গালাগাল করে, মারতে আসে, কিন্তু তোমার হাত তার পায়ে লেগেছে বলে তো খুব ভয়।"

মা বলিলেন, "বাবা, রাবণ কি জানতো না যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ করতে এসেছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে।"

মায়ের পায়ের বাতের ব্যথার উল্লেখ করিয়া বলিয়া-ছিলাম, "মা, শুনতে পাই ভক্তদের পাপ গ্রহণ করেই তোমার এই ব্যাধি। আমার একটি আন্তরিক নিবেদন—তুমি আমার জন্যে ভুগো না; আমার কর্ম্মের ভোগ আমার দ্বারাই ভোগ করিয়ে নাও।"

মা—সেকি বাবা, সেকি বাবা, তোমরা ভাল থাক, আমিই ভুগি।

আহা! সে সময় মায়ের কি এক অপূর্ব্ব করুণা-মূর্ত্তিই দেখিলাম!

জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় মাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় জপ করিয়া দিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "আহা! এদের ইচ্ছে আমার কাছে থাকে, কিন্তু কি করবে সংসারের অনেক কাজ করতে হয়।"

ছেলে বিদেশে যাইবার সময় মায়ের মত সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর আসিলেন এবং সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

*　　　　*　　　　*

একবার আমি তিন সপ্তাহ কলিকাতায় থাকি। বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামান্তর বলিয়াছিলাম, "মা, কিছুদিন কলকাতায় থাকবো। এখানে তোমাকে দর্শন করবার নিয়ম হয়েছে সপ্তাহে মাত্র দু দিন। যদি অনুমতি কর, তবে মাঝে মাঝে আসবো।"

মা—আসবে বই কি। যখন সুবিধা হয়- আসবে, আমাকে সংবাদ দেবে।

একদিন গিয়া বলিলাম, "মা, আমার ত শান্তি হয় না। মন সর্ব্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।" এই কথা শুনিয়া

মা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। মায়ের মুখ দেখিয়া আমার আত্ম-গ্লানি আসিল—কেন মাকে ইহা বলিতে গেলাম। তাঁহার পদধূলি লইয়া শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে উপস্থিত হইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন—মাথাটা গরম।"

তিনি বলিলেন, "সেকি? আপনি মায়ের ছেলে, মা আপনাকে খুব স্নেহ করেন। আপনি আমার নিকট কিসের কাঙাল? মা কি আপনাকে চেয়ে দেখেন নাই?"

আমি—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।

মাষ্টার মহাশয়—তবে আর কি? 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'

তিনবার খুব আবেগের সহিত তিনি এই কথাটি বলিলেন। মায়ের অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিবার অর্থ বুঝিলাম। আমি শান্ত হইলাম। মনে হইল—মা যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টির অর্থ বুঝাইতেই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আমায় পাঠাইয়াছেন।

একদিন ভোরে আমার পরিবার ও একটি মেয়েকে

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম, "মা, ওরা তো সর্ব্বদা আসতে পারে না। এরা আজ সারাদিন তোমার এখানে থাকবে, আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব।"

মা—আচ্ছা, বেশ তো।

আমার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর ছিল না। স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন?" ঐ কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, "তা আর কি হয়েছে? ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে।" এই বলিয়া মা স্বয়ং তাহার কপালে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন।

আমার স্ত্রীর মনে হইয়াছিল—'মা যদি অনুমতি করেন তবে পদসেবা করি।' মা কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলেন, "এস বৌমা, আমার গায়ে মাথায় তেল মাখিয়ে দাও।" তেল মাখাইয়া চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, যদি এই চুল কিছু নিতে অনুমতি দেন তো নিই।' মা ঈষৎ হাসিয়া নিজেই বলিলেন, "এই নাও মা।" তার পর চিরুনির গাত্রসংলগ্ন চুল ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিলেন।

একটি স্ত্রী-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই বৌটি কে মা?"

মা—রাঁচিতে সুরেন থাকে, তার বউ। ঠাকুরের উপর সুরেনের অগাধ বিশ্বাস।

সেদিন মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যান। আমরা যে কাপড় গামছা মায়ের জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারিগণ তাহা অনেকগুলি নূতন কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মা কিন্তু উহার ভিতর হইতে আমাদের দেওয়া কাপড় ও গামছা লইয়া স্নান করিতে গেলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটের ব্রাহ্মণকে মা একটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "বৌমাকে চন্দন পরিয়ে দাও।" আহারের সময় নিজ পাত হইতে তাহাকে প্রসাদ দেন এবং আহারান্তে বিশ্রামের সময় পদসেবা করিতে বলেন। আমার মেয়েটি একখানি কম্বলে শুইয়া তাহা নোংরা করিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহা ধুইয়া দিতে উদ্যত হইলে মা তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া নিজেই ধুইয়া আনিলেন। পরিবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, তুমি কেন ধোবে?" মা উত্তর করিয়াছিলেন, "কেন ধোব না, ও কি আমার পর?"

বৈকালে আমি 'উদ্বোধন' আফিসে গিয়া দেখি একমাত্র উপেন বাবু রহিয়াছেন। শুনিলাম—অন্য সকলে বিবেকানন্দ সোসাইটির উৎসবে গিয়াছেন। আমি নিজেই উপরে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিলে তিনি

বলিলেন, "দেখ, আজ ছেলেরা কেউ নেই, ভক্তদের দর্শনের দিন। তুমিই আজ সকলকে ডেকে আনবে, প্রসাদ দেবে।" কিছুক্ষণ পরে আমি ভক্তদের ডাকিয়া আনিলাম ও প্রণামান্তে প্রসাদ বিতরণ করিলাম। ক্রমশঃ ভক্তগণ চলিয়া গেলেন।

মা বলিলেন, "আজ তুমি আমার ঘরের ছেলেটি হয়েছ—সকলকে ডেকে আনলে, প্রসাদ দিলে।"

আমি—কেন, আমি কি তোমার ঘরের ছেলে নই?

মা—হ্যাঁ, তা বই কি—তুমি আমার আপনার ছেলে।

এই বলিয়া আমার পরিবারকে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, সকলেই আমার ছেলে, তবে কারো কারো সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক। ওর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক। দেখছ না সর্ব্বদা যায় আসে, খুব আপনার।"

তারপর আমাদিগকে প্রসাদ ও পান দিয়া মা আমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "'আর ভয় কি? খুব সহজ হয়ে গেছ তো? তোমাদের এই-ই শেষ জন্ম।"

আমি বলিলাম, "সহজ বই কি? তোমার কৃপা হলেই সব সহজ।"

আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানি আসন তৈয়ারী

করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহা পাইয়া মায়ের খুব আনন্দ। সকলকে দেখান আর বলেন, "আহা দেখ, বৌমা কেমন সুন্দর আসন তৈরী করেছে।" ভক্তের একটি সামান্য জিনিস পাইয়াই তাঁহার এত আনন্দ।

* * *

আর একবার অপর চারিজন ভক্তসহ জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে এমন সময় রওনা হই যে বেলা থাকিতেই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌঁছিবার কথা। সঙ্গে ঐদেশী একটি কুলিও ছিল। আমার জানা-রাস্তা, কিন্তু মায়ের বাড়ীর নিকটে গিয়া পথ ভুল হইয়া গেল। কিছুতেই আর পথ খুঁজিয়া পাই না। ঐদেশী লোকটিরও গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ক্রমে রাত্রি হইল। সঙ্গীরা প্রমাদ গণিলেন। তখন আমরা সকলেই ক্লান্ত। কি করি—এক বাঁশবনের ভিতরে আমি কম্বল পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। মায়ের উপর বড় অভিমান হইল—'মা, আমরাই শুধু তোমাকে খুঁজবো, আর তুমি কিছুই দেখবে না।' এমন সময় দেখি, একটি আলো লইয়া রাসবিহারীদাদা ও হেমেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। এই রাত্রিরে এ পথে তাঁহাদের আগমনে বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এ দিকে আসবো—কোন কথাই ছিল না। ভাগ্যে এ পথে

এসে পড়েছি।" শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমরা বুঝি খুব ঘুরেছ?"

আমি—হাঁ মা, পথ ভুল হয়েছিল।

তখন শ্রীশ্রীমায়ের জন্য নূতন বাড়ী হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারিদ্বয় ঐ কাজে খুব ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীহট্ট হইতে দুইটি ভক্ত আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি পূর্ব্বে (অরুণাচলের) দয়ানন্দ স্বামীর ভক্ত ছিলেন। তিনি ইঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া নিজ ভক্তগণ মধ্যে প্রচার করিতেন। আমি উক্ত ভক্ত দুইটিকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া যাই। তাঁহারা প্রণাম করিলে আমি বলিলাম, "মা, অরুণাচলে দয়ানন্দ নামে এক সাধু নিজেকে অবতার বলেন, এটি তাঁরই ভক্ত ছিল। তিনি বলিতেন "এ প্রহ্লাদ।" মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "অবতারই বটে!"

এবার মা এই ভক্ত দুইটিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

আমি আর একজন সাধুর নাম করিয়া বলিলাম যে, তিনিও অনেক লোককে দীক্ষা দিতেছেন। মা বলিলেন, "এ সব অনেকটা ব্যবসাদার সাধু। তবে কি জান? এতেও উপকার হবে। মানুষ ত কিছু করে না, এদের কথাতেও কিছু কিছু ভগবানের নাম করবে।

"আন্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে। দেখছ না এখন তারকব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি। একটু সার থাকলে কেউ বড় বাদ যাবে না।"

আমাদের সঙ্গী ভক্ত চারটিকে মা দীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছেলেমানুষ ভক্তকে মা দীক্ষান্তে বলিয়াছিলেন, "একশ আট বার জপ করবে।" তাহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হাজার লক্ষ বার জপ করে। মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এখন মনে করছ বটে—সে তো তোমরা পারবে না, কত কাজ তোমাদের করতে হয়। বেশী পার ভালই।"

মাকে পূজা করিবার জন্য একদিন কিছু পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। মা বলিলেন, "কয়েকটি সিংহবাহিনীকে দিয়ে এস, আর কিছু রেখে যাও।"

একটি ভক্ত বলিলেন, "সব ফুল আপনার পায়ে দিয়ে পূজো করবো।"

মা—আচ্ছা, সে হবে। এই ত আমার পা, তার আবার পূজো!

মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুর বলতেন—'শুদ্ধা ভক্তি সকলের সার।' আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই লাভ হয়।" নিকটে আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন; মা চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে

চলিয়া গেলে মা আমাকে একান্তে বলিলেন, "ও কি সকলেরই হয় গা? তবে তোমার হবে।"

মা রাধুকে বলিয়াছিলেন, "রাধু, তোর দাদা এসেছে, প্রণাম কর।" আমি ভাবিলাম—'সে কি? আমি যে কায়স্থ!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—'মা ত আর আমার অমঙ্গল করবেন না।' তখন উভয়েই উভয়কে প্রণাম করিলাম।

একদিন পান্তাভাত খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় মায়ের কাছে গিয়া চাহিলাম। মা বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি লঙ্কা মরিচ আর বড়া ভেজে দিই। তোমাদের দেশে খুব লঙ্কা ভালবাসে।" গ্রামোফোনের অনুকরণে—"অষ্ট গণ্ডার একটাও কম দিমু না" বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

জয়রামবাটীতে অন্য একদিন মা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সারাদিন যেন কুস্তি করছি, এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না। ঠাকুরকে বলে 'রাধু, রাধু' করে মনটা রেখেছি।" আমার মনে হইল—ঠাকুর যেমন 'জল খাব, তামাক খাব' বলিয়া মনকে বাহ্য জগতে একটু নামাইয়া রাখিতেন, এ কি তাই? এত কষ্ট সহ্য করিয়া মা বহুজনহিতায় শরীর রাখিতেছেন?

বিদায়গ্রহণের সময় বলিলাম, "মা, আমার মত তোমার লাখ লাখ ছেলে আছে, কিন্তু তোমার মত মা আর আমার নেই।" এই কথা শুনিয়া মা সজলনয়নে সস্নেহে আমার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

* * *

একবার শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের পর হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে রাঁচি আনিবার প্রস্তাব করিতে আমি জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। তখন চৈত্র মাস। প্রস্তাব শুনিয়া মা বলিলেন, "চৈত্র মাসে কোথাও যেতে নেই। তারপর শরৎ * নিতে এসে এতদিন থেকে গেল, কলকাতায় না গিয়ে আর কোথাও কি করে যাই।"

সেই সময় স্বামী কেশবানন্দের একটি ভগ্নী মারা যান। আমি মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, বুড়ো বয়সে স্বামী কেশবানন্দের মা একটা শোক পেলেন—বড়ই দুঃখের কথা।"

মা বলিলেন, "শোকে তার কিছু করতে পারবে না।"

মায়ের কথা শুনিয়া ফিরিবার পথে কোয়ালপাড়ায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম—তাঁহার শোকের নাম গন্ধও নাই, সেই সদা হাস্যমুখ। ভাবিলাম—

---

* স্বামী সারদানন্দ।

'স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষির শোক হয়েছিল, এ ঘরের যেন সবই নূতন।'

*　　*　　*

'উদ্বোধনে'র বাটীতে একবার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। মাকে প্রণাম করিবার পর মা করজোড়ে ঠাকুরকে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, এদের সকল বাসনা পূর্ণ কর।"

আমি বলিলাম, "সে কি মা, সকল বাসনা পূর্ণ করলে তো উপায় নেই। মনে যে কত কু-বাসনা রয়েছে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের সে ভয় নেই। তোমাদের যা দরকার, যাতে ভাল হয়, ঠাকুর তাই দেবেন। তোমরা যা করছ করে যাও, ভয় কি? আমরা তো রয়েছি।"

*　　*　　*

জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় ভোরের সময় বহির্ব্বাটীতে একটি গো-বৎস বড়ই চীৎকার করিতেছিল। দুধের জন্য তাহাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে দূরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া মা এই বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন—"যাই মা যাই, আমি এক্ষুণি তোকে ছেড়ে দেবো, এক্ষুণি ছেড়ে দেবো।" আসিয়াই গো-বৎসের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি অবাক হইয়া

জগন্মাতার সর্ব্বভূতে করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম। হায়! এমনি করিয়া ডাকিতে পারিলেই তো বন্ধন মুক্ত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ, অসীম করুণা এবং অনন্ত দয়ার কথা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। শত শত ভক্ত সেই পরশমণিস্পর্শে সোনা হইয়াছেন।

শ্রী—

১৫ই পৌষ, মঙ্গলবার, শুক্লপক্ষ, তৃতীয়া তিথি—সন ১৩২০ সাল

কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে যাইবার কোন উপায় নাই, কাহাকে লইয়া যাই। মা যদি অধম সন্তানকে দয়া করিয়া দর্শন দেন তবেই দেখিব—এইরূপ বসিয়া ভাবিতেছি এমন সময় কমলা ও বিমলা আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমায় মা ডাকছেন।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—অভীষ্টসিদ্ধির বুঝি একটি পন্থা বাহির হইবে। কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—'ওরে, মা ডেকেছেন।'

আমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া বিমলাদের বাড়ী গেলাম, তখন সকাল ৭টা হইবে। গিয়া দেখি ললিত ও তাহার মা বসিয়া কথা বলিতেছেন, আমাকে দেখিয়াই ললিতের মা বলিয়া উঠিলেন, "এই তো বিনু এসেছে, মেয়ে আমার কি পাগল দেখ, অমনি ছুটে এসেছে।"

ললিত বলিল, "দিদি, আপনি নাকি শ্রীশ্রীমাকে দেখতে চেয়েছেন? যান তো আমি আজ নিয়ে যেতে পারি।"

আমি—সে তোমার অনুগ্রহ।

ললিতের মা বলিলেন, "সে কি গো? ছোট ভাইকে অনুগ্রহ বলতে আছে?"

আমি বলিলাম, "তবে আর কি বলি বলুন, যদি ওদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করবো তবে তো আমি অনেক আগেই মাকে দেখতে যেতে পারতুম।"

এই আনন্দ সংবাদ—সত্যই মাকে দেখিতে যাইব, সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাই ললিতকে বলিলাম, "ভাই, সত্যি বল যাবে কি-না? যদি যাও তো গাড়ী নিয়ে এস।" এই সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, মাকে তুমি দেখেছ?" আমার এই কথায় ললিত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, "দিদি, আমি মাকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম! আহা! মায়ের কি দয়া, অপূর্ব্ব স্নেহ, দিদি তোমায় কি বলবো! মা আবার আমায় যেতে বলেছেন।"

ললিত গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি গাড়ী আনতে যাচ্ছি, তোমরা প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

আমি, ললিতের মা ও তাহার ভগ্নীগণ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে পাঁচুও গেল।

পারুল বলিল, "দিদি, তুমি সত্যি জান তো মা বাগবাজারে আছেন?" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলাম—মা আছেন কি-না তাতো ঠিক জানি না। প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল; মনে মনে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম, 'হে ঠাকুর, আমায় নিরাশ কোরো না।' বেলা ১০টার সময় গাড়ী 'উদ্বোধন' অফিসের সম্মুখে আসিয়া লাগিল। গাড়ী থামিতেই আমি দ্রুত নামিয়া গেলাম। সম্মুখে 'উদ্বোধন' অফিস; মহারাজগণ কাজ করিতেছেন, সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার তখন জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে! যদি এখনই শুনি মা এখানে নাই, তবে আমি কি করিব—ভাবিয়া যেন জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "মা আছেন?" আমার কথা শুনিয়া মহারাজগণ মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কেহ কোনও উত্তর দিতেছেন না। ইতোমধ্যে ললিত গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে চলিয়া গেল দেখিয়া আমিও উহার পিছনে খানিক দূর গিয়াছি, এমন সময় ললিত ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"মা আছেন।" আমার প্রাণের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা সরিয়া গেল, আমি তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখের ঘর ডান দিকে রাখিয়া আমি বাঁ দিকের বারান্দা দিয়া চলিলাম। সম্মুখে দেখিলাম—একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই-তিনটি পুরুষ-ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতে-ছেন দেখিয়া আমি বুঝিলাম ইনিই শ্রীশ্রীমা, যাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি যে তখন কি করিয়াছি মনে নাই। আমাকে দেখিয়াই ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া মায়ের পা দুটি ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হতে এসেছ, কেন এসেছ?"

আমি—কেন এসেছি তা জানি না মা। মা, আপনি এনেছেন তাই এসেছি।

এমন সময় ললিতের মা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; খানিক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ইনিই কি শ্রীশ্রীমা?"

আমি—হ্যাঁ।

তখন সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার ঘরে

উপস্থিত হইলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলাম। মা সম্মুখের তক্তাপোশের উপর বসিয়া আমাদের বলিলেন, "বস মা, বস।" আমরা তাঁহার পদতলে বসিলাম। ললিতের মা সংসারী লোক, মা তাঁহার সহিত সংসারীর ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

ললিতের মা বলিলেন, "মা, ঠাকুরের কথা আমাদের কিছু বলুন, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু উপদেশ দিন।"

মা—আমি কিছুই জানি না, মা; ঠাকুরের মুখে যা শুনেছি; তা মা, ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়ো, তাতেই সব উপদেশ পাবে।

নীচে গাড়ীভাড়া মিটাইয়া ললিত উপরে আসিয়াই একেবারে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল এবং নিতান্ত আর্ত্তস্বরে দর্শকবৃন্দকে আকুলিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, "মা দয়াময়ি গো, দয়া করুন। মাগো, আপনি এই জগৎ উদ্ধার করতে এসেছেন, আমাকেও টেনে নিন, মা। আমি আপনার চরণ ছাড়ব না, আমাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা স্থির নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।

কিছুক্ষণণ পরে বলিলেন, "অমন কোরো না বাবা, ওঠ।"

ললিত পনর-ষোল বৎসরের বালক মাত্র। বালকের ছদ্মবেশে আবরিত মহাশক্তি এখন বিকাশোন্মুখ। দিব্য শ্যামবর্ণ সুগঠন চেহারা, ভিতরে ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাস্রোত যেন কানায় কানায় পরিপূর্ণ, বাহিরেও সেই অনুরাগ প্রতিভাত হইতেছে। "আমায় শ্রীচরণে স্থান দিন মা, বলুন, না হলে আমি উঠবো না, বলুন আমায় নিয়েছেন" বলিয়া ললিত আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটি ঘিয়ের ভাঁড়ে পা ঠেকিয়া যাওয়ায় সে অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল, "আমি একি করলুম, কেউ ভক্তি করে মাকে ঘি দিয়েছে, আমার তাতে পা লেগে গেল, ছি! ছি! আমি একি করেছি!" ইহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই সময় ঠাকুরঘরে মস্তকের উর্দ্ধভাগে চুল বাঁধিয়া এক গৌরবর্ণা বিধবা বৃদ্ধা ঠাকুরের সেবাকার্য্যে নিবিষ্টা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে দুঃখ করো না, পা লেগেছে তা আর কি করবে? পা তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়, এ সৃষ্টির ভিতরে পা দুটাও যে আছে, পা শরীরেরই একটা অংশ।" আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল ও সরল

উদার কথাগুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ললিত তাঁহার কথায় যেন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" "ঠাকুর তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন" বলিয়া মা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর ললিত নীচে চলিয়া গেল।

একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ের হাত ধরিরা একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এই সময়ে দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা, এটি আমার মেয়ে। এর একটি মেয়ে হয়েছিল, আজ সকালে সেটি মারা গিয়েছে ; এ বড়ই শোক-বিহ্বলা, তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, সান্ত্বনা পাবে বলে।" ইহা শুনিয়া আমরা সকলে চমকিত হইয়া উঠিলাম। মা বলিলেন, "এস মা, এস।" মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসিয়া মায়ের কাছে বসিল এবং পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। মা ঈষৎ সরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, আমায় ছোঁবে কি? এর যে অশৌচ হয়েছে।" এই কথা শুনিয়া মেয়েটির মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল, সে সঙ্কুচিতা হইয়া বসিয়া রহিল। মা তাহার মুখপানে চাহিয়াই সকরুণ হইয়া বলিলেন, "আহা, বাছা! বড় ব্যথা পেয়ে আমার কাছে

এসেছ সান্ত্বনা পাবে বলে। আমি তোমার মনে কি কষ্ট দিলুম! তা হোক অশৌচ, এস মা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।" এই বলিয়া মেয়েটির আরও কাছে সরিয়া বসিলেন। সে তখন অশ্রুজলে ভাসিয়া মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল; মা'ও তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মা মেয়েটির কাছে বসিয়া মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"আমি তোমায় কি বলবো মা, আমি তো কিছুই জানি না। ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখ, আর জানবে তিনি সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বোলো—ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও। এ রকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিও।" তার পর আমাদের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "আহা! আজই শোক পেয়েছে! আজ কি স্থির হতে পারে?" মেয়েটির পিতা, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন; পিতাপুত্রী উভয়ে মাকে প্রণামপূর্ব্বক দুঃখ নিবেদন করিয়া শান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ঘর নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, আমার

একটি কথা আছে। যদি আপনি অনুমতি করেন তবে বলি।” আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সেই সেবানিরতা সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধাটি (পরে জানিলাম তিনি পূজনীয়া গোলাপ-মা) বলিলেন, “বল মা, বল, তোমার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে মায়ের কাছে বল, মার কাছে লজ্জা কি!” তখন আমি বলিলাম, “মা, কথা আর কিছু নয়—আমি স্বপ্নে ঠাকুরকে ও আপনাকে দেখেছিলুম, যেন আপনি আমায় মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নি। সেই থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নেবার জন্যে আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি।”

মা প্রসন্নমুখে বলিলেন, “বেশ তো, আজই তোমায় দীক্ষা দেব, কিন্তু তোমার স্বামীর মত আছে তো?”

আমি—আমার স্বামীকে আমি একথা বলেছিলুম, তিনি বলেছেন, ‘আমার অমত নেই, আমি এখন দীক্ষা নেব না, তুমি নিতে পার।’

মা—তোমার স্বামী কোথায়?

আমি—রায়পুরে।

মা কলের ঘর দেখাইয়া বলিলেন, “এখান হতে হাত পা ধুয়ে এস।”

আমি—মা, আমি এখনো স্নান করি নি।

মা—তা হোক, স্নান করতে হবে না।

আমি কলঘর হইতে হাত পা ধুইয়া মায়ের নিকট ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি মা দুখানা আসন পাতিয়াছেন। সামনে কোশাকোশীতে গঙ্গাজল লইয়া নিজে ঠাকুরের পানে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহার বাম হাতের নিকট আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন, কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া মা আচমন করিলেন এবং আমায় সেইরূপ করাইলেন; পরে বলিলেন, "কোন্ দেবতায় তোমার ভক্তি?" আমি বলিলে, তিনি আমায় দীক্ষা দিয়া কিরূপে জপ করিব দেখাইয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে একটা পরমানন্দের প্রবাহ হৃদয়মধ্যে রহিয়া গেল, ভিতরে বাহিরে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিয়া আমায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি কিছুই জানি না, মা সব শিখাইয়া দিলেন। দীক্ষান্তে মা বলিলেন, "দক্ষিণা দাও।"

আমি—মা, আমি তো কিছুই জানি নে, আপনি বলে দিন আমি কি করবো, আমি তো কিছুই জানি নি।

মা তখন উঠিয়া গিয়া ফুল, কমলালেবু, কুল প্রভৃতি দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "বল—আমার পূর্ব্বজন্মের, ইহজন্মের জানত অজানত যাহা কিছু পাপ, পুণ্য করিয়াছি

সব তোমাকে সমর্পণ করিলাম।" আমিও তাই বলিলাম, মা হাত পাতিয়া সব গ্রহণ করিলেন।

মা! এই দীন হীন কাঙ্গাল অধমের উপর একি অহৈতুকী দয়া তোমার? আমার প্রাণ মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—একি দেখিলাম! একি শুনিলাম! আমি কায়-মন-প্রাণ মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আজ ধন্য হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় আসিয়া আবিষ্টের ন্যায় ঘণ্টাখানেক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময় ঘরে একটি বালিকার চীৎকার কোলাহল আর মায়ের কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর গেলাম। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "বস, মা, বস।" আমি বসিলে মা বলিলেন, "এটি আমার ভাইঝি, নাম রাধারাণী। ওর মা পাগল হতে আমিই ওকে মানুষ করি।" মা তাহাকে ধরিয়াছিলেন কিন্তু সে অস্থির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মা তাহাকে কত রকম বুঝাইতেছিলেন। তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহাকে কাপড় পরাইলেন, নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিলেন আর কতই স্নেহপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। আমি শ্রীশ্রীমার এই প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। এই সময় আমায় গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ডাকায় আমি উঠিয়া গেলাম।

স্নানের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মা ঠাকুরের ভোগ দিতেছেন। ঠাকুরঘর হইতেই আসিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগের ঘরে গেলেন, সেখানে ভোগ সজ্জিত রহিয়াছে; পরে সেই ঘরের দোর বন্ধ করিয়া আমাদের ঘরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজগণ আহারে বসিলেন। গোলাপ-মা পরিবেশন করিতেছেন, আহার শেষ হইলে মহারাজগণ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের ভোগের থালা মায়ের জন্য মাঝের ঘরে আনা হইল এবং আমরা যে কয়েকটি স্ত্রীলোক আছি আর পাঁচু (পাঁচ বৎসরের একটি বালক যে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল) এই কয়-জনের জন্য সেই ঘরে জায়গা হইল। শ্রীশ্রীমা এবং আমরা সকলেই আহারে বসিলাম। আমার ইচ্ছা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তাই চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সকলে ভাত মাখিয়া লইলেন, আমি হাতও দিলাম না। মা দুই-তিন বার বলিলেন, "খাও, খাও।" এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গা?" তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে দুটি প্রসাদ দিন।" মা তখন ভাত মাখিয়া অল্প দুটি খাইয়া আমার পাতে তুলিয়া দিলেন। আহা! কি অমৃতই সে দিন খাইলাম, কি বলিব! অড়হরের ডাল, কফির চচ্চড়ি, চালতের অম্বল, আর গোলাপ-মা মাছ রাঁধিয়া-

ছিলেন, ভারি সুন্দর হইয়াছিল। পাঁচু তো "আরো চচ্চড়ি খাব" বলিয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাকে চুপি চুপি ধমকাইলেও শুনে না। এ সময় গোলাপ-মা আবার আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, অমন করছে কেন ছেলেটি?"

আমি বলিলাম, "ওকে আনতে চাই নি মা, আমি লুকিয়ে আস্‌ছিলুম, গাড়ী যেই কিছুদূর গিয়েছে, ও রাস্তায় খেলা করছিল, অমনি ছুটে এসে গাড়ীতে উঠলো, আর এখন 'আরও চচ্চড়ি খাব' বলে গোলমাল করছে।" এই কথা শুনিয়া মা, গোলাপ-মা সকলে হাসিতে লাগিলেন। গোলাপ-মা বলিলেন, "তুমি ওকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে—পারবে কেন? ওর সুকৃতি ছিল তাই মাকে দেখতে পেলে, একি কম ভাগ্য গা! ওর ভাল হবে।" মা-ও "হ্যাঁ, তাই তো" বলিয়া 'সায়' দিলেন।

আহারের পর আমি সারাদিন মায়ের কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার রায়পুর যাইবার কথা ছিল। সে দূর দেশ, আর শীঘ্র যদি মাকে না দেখিতে পাই সেই আশঙ্কায় পারুল ও কমলা আমায় ডাকিয়াছিল তবুও আমি গেলাম না। ছাদে মা চুল শুকাইতেছিলেন, শীতকাল তাই রোদে বসিয়াছেন আর আমার কাছে

বাপের বাড়ীর গল্প করিতেছেন, "রাধুকে মানুষ করলুম, সেটি পাগল, খাইয়ে না দিলে খায় না; আর আমারও শরীর ভাল নয়, মা, বাতের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। এই অসুখের জন্যে কাশী বৃন্দাবন গেলুম, কিন্তু কিছুই হল না।"

আমি—কাশী বৃন্দাবন গিয়েছিলেন ?

মা—কি করে বলবো।

একথা সেকথার পর মা বলিলেন, "তোমার এই অল্প বয়স, ছেলেমানুষ তুমি, তোমার এ সময়ে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা কেন হল ?"

আমি—কি জানি মা, সংসার আমার ভাল লাগে না। প্রাণ যেন সংসার চায় না, প্রাণে বড়ই অশান্তি ছিল, আজ আমি শান্তি লাভ করেছি। আর এ সংসারও অনিত্য, দুদিনের জন্য, দেখ্‌ছি সবই মিথ্যা। কি করে তাতেই বা মন বসবে, মা ?

এই সময়ে মায়ের সমবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। আমি মায়ের খুব কাছে বসিয়াছিলাম, তাঁহার ছায়া আমার গায়ে পড়িয়াছে দেখিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটি আমায় ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন মেয়ে গা, মায়ের ছায়ার উপর বসেছ ? পাপ হবে যে, সরে বস।" আমি ইহা জানিতাম না। মা

যে আপন হইতেও আপনার, তাই একেবারে কাছে বসিয়াছিলাম, এখন একটু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিলাম। উক্ত স্ত্রীলোকটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে ?"

মা—এ মেয়েটি আজ দীক্ষা নিয়েছে, বড় ভক্তিমতী মেয়ে।

মায়ের এই কথায় আমি লজ্জিতা হইয়া পাশের ঘরে পারুলরা গল্প করিতেছিল সেখানে উঠিয়া গেলাম। এমন সময় ললিত আসিয়া বলিল, "দিদি, চল গাড়ী প্রস্তুত, বেলা গিয়েছে।" আমি মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম।

মা বলিলেন, "আবার কবে আসবে, মা ?"

আমি—আপনি যেদিন মনে করে আনবেন সেই দিনই আসবো ; আমার কোন সাধ্য নেই। মা, আশীর্ব্বাদ করুন ; আমায় মনে রাখবেন, মা।

মা—আবার এস, মা।

আমি কাতর নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম ; তিনি দুই খিলি পান আনিয়া আমায় দিলেন। আমি মায়ের পদতলে লুণ্ঠিতা হইয়া যেন 'আমাকে রাখিয়া' দেহটি লইয়া বিদায় হইলাম। মাও সজল নয়নে সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার অন্তর-বাহির আজ

পরিপূর্ণ; গাড়ীতে বসিয়াও যেন তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। মায়ের কথা মা রক্ষা করাইয়াছিলেন; দুই বৎসর পরে রায়পুর হইতে ফিরিয়া মায়ের অসুখের সময় আবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম।

শ্রীমতী—

(৯)

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন সকাল বেলা মাকে দর্শন করিতে যাই। তখন ঘরে আর কেহ ছিলেন না। মা সর্ব্ব-দক্ষিণের ঘরে ছিলেন। এই সময় কয়েক দিন একটু ভাল ছিলেন। দিনের বেলায় ঐ ঘরেই মায়ের বিছানা করিয়া দেওয়া হইত। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেই মা বাড়ীর সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মায়ের শরীর খুব রুগ্ন দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, আপনার শরীর এবার বিশেষ খারাপ হয়ে গেছে। এত দুর্ব্বল শরীর কখনও দেখি নাই।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, দুর্ব্বল খুব হয়েছে। মনে হয় এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করাবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্ব্বদা তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। এই দেখ না, রাধুকে এত ভালবাসতুম, ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত করেছি, এখন ভাব ঠিক উল্টে গেছে। ও সামনে এলে ব্যাজার বোধ হয়, মনে হয়— ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নীচে নামাবার চেষ্টা করছে। ঠাকুর তাঁর কাজের জন্যে এত কাল এই

সব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন। নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হোত ?”

আমি—মা, আপনি এরূপ কথা বললে আমাদের বড় কষ্ট হয়। আপনি যদি চলে যান, আমাদের উপায় কি হবে ? আমাদের ত্যাগ-তপস্যার বিশেষ অভাব। বৈরাগ্য ত একেবারে নাই বললেই চলে। আপনার শরীর না থাকলে আমরা কিসের জোরে মহামায়ার রাজত্বে বেঁচে থাকবো ? মনে যখন কোন তুর্ব্বলতা এসেছে, আপনার কাছে বলে তা হতে বাঁচবার রাস্তার খবর পেয়েছি। এখন আমরা কোথায় যাব ? আমাদের যে একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে হবে।

মা—(দৃঢ়তার সহিত বলিলেন) কি ! তোমরা নিরাশ্রয় হবে কেন ? ঠাকুর কি তোমাদের ভাল মন্দ দেখছেন না ? অত ভাবো কেন ? তোমাদের যে তাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছি। একটা গণ্ডির মধ্যে তোমাদের ঘুরতে হবেই, অন্য কোথাও যাবার জো নেই। তিনি সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষা করছেন।

আমি—ঠাকুরের দয়ার কথা অনেক সময় মনে হলেও সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক সময় বিশ্বাস হয়, অনেক সময় সন্দেহও আসে। আপনাকে সাক্ষাৎ

দেখছি, ভাল মন্দ অনেক কথা বলেছি, আপনিও তার ভাল মন্দ বিচার করে কখন কি ভাবে চললে আমার ভাল হবে, বলে দিয়েছেন। এতে আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, এটা বিশ্বাস হয়।

মা বলিলেন, "ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল। আজ যে তোমার বাড়ীর কথা, মার কথা এত জিজ্ঞাসা করলুম কেন জান? প্রথম গণেনের মুখে তোমার বাপ-মরার খবর শুনলুম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার মার আর কে আছে, খাবার-সংস্থান আছে কি-না, তুমি না থাকলে তাঁর চলবে কি-না; যখন শুনলুম তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে, তখন মনে হল 'যাক্, ছেলেটার যদি একটু সৎবুদ্ধি হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তার সৎপথে থাকবার বিশেষ বাধা পড়বে না।'

"মার সেবা করা সকলের উচিত, বিশেষ যখন তোমরা সকলের সেবা করবার জন্যে এখানে এসেছ। তোমার বাপ যদি টাকা না রেখে যেতেন তা হলে তোমাকে টাকা রোজগার করে মার সেবা করতে বলতুম। ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি তোমার কোন উৎপাত রাখেন নি। কেবল মেয়েমানুষের হাতে থেকে টাকাগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, এর একটা বন্দোবস্ত করা ও দেখাশুনা

করলেই হয়ে যাবে। এটা কি কম সুবিধে? টাকা-রোজগার মানুষ সৎভাবে করতে পারে না—মন বড় মলিন করে দেয়। এজন্যে তোমায় বলছি, টাকা-কড়ির ব্যাপার যত শীগগির সম্ভব সেরে ফেল। বেশী দিন ওসব নিয়ে থাকলেই ওতে একটা টান পড়বে, টাকা এমনি জিনিস! মনে করছ ওতে আমার টান নেই, যখন একবার ছাড়তে পেরেছি তখন আর টান হবে না, যখন ইচ্ছে চলে আসব। না, একথা কখনো মনে ভেবো না। কোন্ ফাঁক দিয়ে তোমার গলা টিপে ধরবে, তোমায় বুঝতে দেবে না। বিশেষ, তোমরা কলকাতার ছেলে, টাকা নিয়ে খেলা করতে তোমরা জান। যত শীঘ্র পার মার বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে পালিয়ে যাও। আর মাকে যদি কোন তীর্থস্থানে নিয়ে যেতে পার, দুজনে বেশ ভগবানকে ডাকবে, মা-ব্যাটা-সম্পর্ক ভুলে। এই শোকের সময় মার মনে খুব কষ্ট, এটি হলে বেশ হয়। তোমার মারও ত বয়স হয়েছে। তাঁকে খুব বোঝাবে। এই সব কথা মার সঙ্গে কইবে।

"মার পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পার তবেই ত ঠিক ছেলের কাজ করলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে। তবে

তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন তখন অন্য কথা। তোমার মাকে একবার এখানে নিয়ে এস না, দেখব কেমন। যদি ভাল বুঝি, দু-একটা কথা বলে দেব। কিন্তু সাবধান, মার সেবা করছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতো না, একটা বিধবার খাওয়াপরা বই ত না! কত টাকাই বা চাই! কিছু লোকসান দিয়েও যদি তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা করবে। ঠাকুর ত টাকা ছুঁতেই পারতেন না। তোমরা তাঁর নামে বেরিয়েছ, সব সময় তাঁর কথা মনে ভাববে। জগতে যত অনর্থের মূল—টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে, সাবধান!"

আমি—আমার মনে হয়েছিল আমার মাকে একদিন আপনার কাছে আনবো। কিন্তু আপনার শরীর দেখে আর আনবার ইচ্ছে হচ্ছে না।

মা—না, না, একদিন নিয়ে এস। কত লোক তো আসছে। আর, শরীর তো দিন দিন খারাপ হবেই। শীগগির শীগগির নিয়ে এস। সকাল বেলাটায় শরীর মন্দ থাকে না। সকাল বেলা আনতে পারবে না? বেশী বেলা কোরো না, দেরি হলে এরা ত আসতে দেবে না।

আমি—মা, আপনার কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে।

বারবার নিজের শরীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছেন, তাতে মনে হয়, শরীর ধরবার আর আপনার ইচ্ছে নেই।

মা বলিলেন, "এ শরীর থাকা না থাকা আমার হাত নয়—তাঁর ইচ্ছা। তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই আমার কাছে তোমরা কত সময়ই বা থাক? কখন মঠে, কখন বা বাইরে থাক। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার বা কাছে থাকবার কয়জনের সুবিধা হয়? তোমরা তো কখন কোথায় থাক খবর পর্য্যন্ত দাও না।"

আমি—আমাদের থাকবার সুবিধা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের মনের বিশ্বাস আছে আপনি আছেন, মনে যখন কোন দুর্ব্বলতা আসবে আপনার কাছে আসলেই তা দূর হয়ে যাবে।

মা—তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তা হলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের এক-জনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের ভাল-মন্দের ভার যে নিতে হয়েছে। মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা! কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়! তাদের জন্যে কত চিন্তা করতে হয়! এই দেখ না, তোমার বাপ মারা গেলেন,

আমারও মনটা খারাপ হল। মনে হল—ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার এক পরীক্ষায় ফেললেন। কিসে ঠেলেঠুলে বেঁচে উঠবে—এই চিন্তা। সেই জন্যই তো এত কথা বললুম। তোমরা কি সব বুঝতে পার? যদি তোমরা সব বুঝতে পারতে, আমার চিন্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর নানান ভাবে নানা জনকে খেলাচ্ছেন—টাল সামলাতে হয় আমাকে। যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাঁদের তো আর ফেলতে পারি নে।

আমি—মা, আপনার অবর্ত্তমানে কার কাছে যাব, কি হবে, ভাবতে গেলে বড় ভয় হয়।

মা বলিলেন, "কেন, এই রাখাল টাখাল এই সব ছেলেরা রয়েছে, এরা কি কম? তুমি ত রাখালকেও খুব ভালবাস। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। কি আর জিজ্ঞাসাই বা করবে? বেশী জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়। একটা জিনিস হজম করতে পারে না, আবার দশটা জিনিস মনের মধ্যে পুরে এটা না ওটা কেবল এই চিন্তা। যে জিনিস পেয়েছ, তাইতে ডুবে যাও। জপধ্যান করবে, সৎসঙ্গে থাকবে, অহঙ্কারকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না। দেখছ না রাখালের কেমন বালক ভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি। শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গাম পোহায়—মুখটি বুঁজে

থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিনরাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যে এদের নেমে থাকা। এদের চরিত্র চোখের সামনে ধরে রাখবে, এদের সেবা করবে; আর সর্ব্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত। যখনি মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তাঁর ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে—মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।"

শ্রী—

শ্রীশ্রীমা আমাকে দীক্ষাদানের পর বলেছিলেন, "দেখ মা, আমি কড়ে রাঁড়ীকে মন্ত্র দিই না, তবে তুমি ভাল, তাই দিলুম। দেখো, যেন আমায় ডুবিয়ো না। শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়। সব সময় ঘড়ির কাঁটার মত ইষ্ট-মন্ত্র জপ করবে।"

আর একবার শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় বলেছিলেন, "কারু সঙ্গে মিশবে না, কারু জামাই বেয়াই কুটুম আসুক, তার কোন কিছুতেই থাকবে না। 'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না মন কারো ঘরে।' ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালবাসতেন, দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে, আর তাঁর সেবা, জপ-ধ্যান বাড়াবে, ঠাকুরের বই সব পড়বে।"

একদিন মা ও আমি ছিলুম, আর কেউ ছিলেন না। মা বললেন, "দেখ মা, পুরুষ-জাতকে কখনও বিশ্বাস কোরো না—অন্য-পরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোরো না।"

মঠে বা যে-সব স্থানে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন সে-সব জায়গায় বেশী যেতে বারণ করতেন। বলতেন, "দেখ মা, তোমরা তো ভাল মনে ভক্তি করেই যাবে কিন্তু তাতে তাদের মনে ক্ষতি হলে সেই সঙ্গে তোমারও পাপ হবে।"

যখন-তখন যার-তার সঙ্গে তীর্থে যেতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার হাতে দু পয়সা হয়, দশ-বিশ জন বামুন খাইয়ে দিও।" একটি স্ত্রী-ভক্ত সামনে বসেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ একজন, তীর্থ করতে গিয়ে কেমন ঠোক্কর খেয়ে এসেছে—'তীর্থগমন, দুঃখভ্রমণ, মন-উচাটন হয়ো নারে; ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তের, যদি করতে পার'।"

একদিন স্ত্রী-ভক্তেরা অপর একজনের নামে পাঁচ জনে পাঁচ রকম সমালোচনা করছিলেন; সেই সময় মা আমায় বললেন, "তুমি তাকে ভক্তি করবে। সে-ই তোমায় প্রথমে এখানে এনেছিল।"

পরের একটি ছেলে নিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলুম। তার উত্তরে রাধুর জন্য নিজের অবস্থা দেখিয়ে মা বলেছিলেন, "অমন কাজও করো না। যার উপর যেমন কর্ত্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আমার মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনে আমাদের বাড়ীর গুরু আমায় শাপ দিয়েছিলেন, মাকে সে কথা লিখেছিলুম। মা চিঠিতে উত্তর জানালেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই।"

জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত একদিন আমায় বলেছিলেন, "মঠে ফঠে আর এখন কিছু নেই।"—তাই আমি মাকে গিয়ে বলেছিলুম। মা শুনে চমকে উঠে বললেন, "যদি এখনও ধর্ম্ম কিছু থাকে তো সে এখানে, আর মঠে।"

একদিন জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের কথা আলোচনা করতে করতে আমি ও নলিনীদিদি মাকে বললুম, "কিন্তু তার উপর তো আমাদের কোন অভক্তি আসছে না।"

মা বললেন, "সে যে ঠাকুরকে ডাকে। যে ঠাকুরকে ডাকে সে যেমনই হোক, তার উপর অভক্তি হয় না।"

শ্রীমতী—

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। ১৯০৮ এর মধ্যভাগে বর্ষাকালে দ্বিতীয় বার দর্শন হয়। এবার বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হই। প্রণাম করিলে পর শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি মাষ্টার মশায়ের ছাত্র ?"

আমি—না মা ; আমি তাঁর কাছে যাই।

মা—তিনি কেমন আছেন ? তুমি কি শীগগির গিয়েছিলে ?

আমি—ভাল আছেন। আমি আট দিন আগে গিয়েছিলুম।

মধ্যাহ্নে আহার করিবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনার কলকাতা যাওয়া হবে কি ?"

মা—ইচ্ছে তো আছে পূজোর সময় যাই। তার পর মা যা করেন।…তোমাদের জমিতে ধান হয় ?

আমি—হ্যাঁ মা, হয়।

মা—বেশ। আমাদের দেশে ভাল ধান হয় না। তোমাদের কলাই হয় ?

আমি—হ্যাঁ মা।

মা—বেশ ভাল।

রাত্রে আহারের সময় শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাড়ীতেই থাক এখন?"

আমি—হাঁ মা, বাড়ীতেই আছি, আমার বড় বিপদ —খুব অসুখ হয়েছিল, তার পর বিবাহ।

মা—বিবাহ কি হয়ে গেছে?

আমি—হ্যাঁ মা।

মা—মেয়েটির বয়স কত?

আমি—প্রায় তের বছর।

মা—যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে; আর কি করবে?

আমি—মাষ্টার মহাশয় বিবাহ করতে বারণ করেছিলেন।

মা—আহা! নিজে অনেক কষ্ট পেয়েছেন কি-না! তাই বলেন, আর তোরা কেউ বিয়ে করিস্ নি রে!

আমি—সংসারে বড় ব্যাঘাত। সংসারে থাকলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে।

মা—নিশ্চয়। কেবল টাকা, টাকা, টাকা।

আমি—বিষম যন্ত্রণা।

মা—ঠাকুরের সংসারী ভক্তও ত আছে। ভাবনা কি?

আমি নিস্তব্ধ হইয়া আছি।

মা—আমার ভায়েরা বিবাহ করেছে।

আমি—আপনার অনুমতি-অনুসারে?

মা—কি করবো। ঠাকুর বলতেন, 'বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই ভাল থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।' আর আমরা খুড়ো-জ্যাঠার যেমন সেবাশুশ্রূষা করেছি, এখনকারের ভাইঝিরা তেমন করে না।

আমি—ক্রমশঃ সব পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে।

মা—তা বটে। দেখ না, আগে আমি পিঁপড়ে মারতে পারতুম না, কিন্তু এখন বেড়ালকেও এক ঘা বসিয়ে দিই।

"ঠাকুর বলতেন, 'এ-ও কর, ও-ও কর।' বলতেন, 'তুঁহুঁ তুঁহুঁ।' জীব অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে তবে বলে, তুঁহুঁ তুঁহুঁ।

"স্বার্থ! যতক্ষণ মুটো করে ততক্ষণ আপনার, তার পর আর নয়।

"ভয় কি, বিবাহ করেছ—ঠাকুরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হয়ে যাবে। হয়ত তার কোন সুকৃতি আছে। বলতেন, 'বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যার জোর বেশী'—অর্থাৎ অবিদ্যামায়া সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে।"

'জগদম্বা আশ্রম'—কোয়ালপাড়া, বাঁকুড়া

এপ্রিল ২০, রবিবার, ১৯১৯

মণীন্দ্র, সাতু ও নারায়ণ আয়াঙ্গার (জনৈক মাদ্রাজী ভক্ত) প্রভৃতি সকাল বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। মা এক মাসের উপর হইল আসিয়াছেন। পুরুষ-ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে থাকেন এবং তথায় খাওয়াদাওয়া করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকুর ছেলের খুব অসুখ—ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, জয়রামবাটীতে আছে। বৈকুণ্ঠ মহারাজ তাঁহাকে দেখিতেছেন। মা সেজন্য খুব চিন্তিতা—কি হয়!

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বসিতেই প্রথমে ঐ কথাই উঠিল।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—মা, আপনার আশীর্ব্বাদে ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

মা—(হাতজোড় করিয়া ঘরের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে দেখিয়া) উনি আছেন।

সাতু—মাকুর ছেলের জন্যে ইনি (নারায়ণ আয়াঙ্গার) অনেক করছেন (ডিপ্‌থিরিয়ার ইন্‌জেক্‌সন্‌ আনিবার জন্য কলিকাতায় লোক পাঠানো ইত্যাদি)।

মা—হ্যাঁ, ভাল লোক। কালোকে কলিকাতা পাঠানো, টাকা খরচ করা—উনি না থাকলে কে এত করতো ?

নারায়ণ আয়াঙ্গার—আমি যন্ত্র, ঠাকুর যন্ত্রী। আমাকে যন্ত্রের মত কাজ করাচ্ছেন।

মা—ঠাকুর বলেছিলেন, 'যার (ধন-ধান্য) আছে সে মাপো (মেপে দেওয়া); যার নাই সে জপো।'

নারায়ণ আয়াঙ্গার—জপ করবার সময় কি আচমন করা প্রয়োজন ?

মা—হ্যাঁ; ঘরে হলে আসন-আচমন প্রয়োজন। রাস্তায় বা অন্যত্র পথে ঘাটে নাম করলেই হবে।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—শুধু নাম ? মন্ত্রজপ নয় ?

মা—হ্যাঁ, মন্ত্রজপও করবে বই কি। তবে মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ করছে কিন্তু মন নেই, তাতে ফল কি ? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—আমি যা করছি তাতেই হবে, না আরও প্রয়োজন ?

মা—যা করছ তাই কর। তুমি তো তাঁর কৃপাপাত্র আছই।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—তু-তিন দিন সরলভাবে ডাকলে দর্শন পাওয়া যায়; এতদিন ডাকছি দর্শন হয় না কেন?

মা—হ্যাঁ, হবে বই কি। শিববাক্য, আর তাঁর মুখের কথা—সে কথা মিথ্যা হবার জো নেই। সুরেন্দ্রকে (মিত্র) তিনি বলেছিলেন, 'যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।' (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তাও না পার (ঠাকুরকে দেখাইয়া) 'শরণাগত'। এটুকু মনে রাখলেই হল—আমার একজন দেখবার আছেন, একজন মা কি বাবা আছেন।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—আপনি বলছেন তাই আমার বিশ্বাস।...

রাধুর একটি সন্তান হইয়াছে। সন্তান হইবার পর হইতেই রাধু শয্যাগত। তাহাকে খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, তাই মা এবার উঠিবেন।

মা—এখন রাধুকে খাওয়াতে যাব।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন। নারায়ণ আয়াঙ্গার শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন, মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মণীন্দ্র প্রণাম করিবার সময় মা বলিলেন, "বৌমার

(মণীন্দ্রের মার) কি বিশ্বাস! কাশীতে যেতে বলায় বলেছিল, 'এই আমার কাশী, আমি কোথাও যাব না'।"

মণীন্দ্রের মা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকিতেন। এক বৎসরের উপর হইল তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের খুব সেবা করিয়াছিলেন। মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার এখানে কেউ বেশী দিন থাকতে পারে নি, কেদারের মা ছিল আর তুমি আছ।"

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সংবাদ আসিল মাকুর ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ। শুনিয়া মা অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন। ব্রহ্মচারী বরদাকে বলিলেন, "পাল্কী ঠিক করে রাখ, কাল সকালেই আমি যাব যদি ছেলে ততক্ষণ বেঁচে থাকে। সকালেই আমাকে সংবাদ এনে দেবার কি হবে?"

মণীন্দ্র—আমি ও সাতু খুব ভোর ভোর সংবাদ এনে দেব।

একটু পরেই বৈকুণ্ঠ মহারাজ জয়রামবাটী হইতে ফিরিলেন। মাকে এই সংবাদ দিতেই চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ছেলে নেই?"

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, "কতকক্ষণ মারা গেল?"

বৈকুণ্ঠ মহারাজ—সাড়ে পাঁচটার সময়।

মা—এখন গেলে দেখ্‌তে পাব ?

বৈকুণ্ঠ মহারাজ—না মা, নিয়ে গেছে।

মা খুব কাঁদিতে লাগিলেন। একটু থামছেন তো আবার কাঁদছেন।

স্বামী কেশবানন্দ মাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাতে মা কাঁদিয়া বলিলেন, "কেদার গো, আমি ভুলতে পারছি নে।"

ছেলেটি একবার মাকুর সঙ্গে জয়রামবাটী যাইবার সময় কোথা হইতে কতকগুলি গুলঞ্চ ফুল কুড়াইয়া আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়া বলিয়াছিল, "দেখ পিসীমা—কেমন হয়েছে ?" তারপর সে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ধূলা লইল। পরে ফুলগুলি জামার পকেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শরৎ মহারাজ তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। অসুখের সময় ছেলেটি 'লালমামা লালমামা' বলিয়া শরৎ মহারাজকে খুব ডাকিয়াছিল। মা বলিলেন, "হয় তো কোন ভক্ত এসে জন্মেছিল। শেষ জন্ম হবে। নইলে তিন বছরের ছেলের অত বুদ্ধি, অমন করে পুজো করে গা। লালনপালন করে আমার কষ্ট।"

এই সব কান্নাকাটি ও শোকে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা মেয়েদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের খাওয়া হইয়াছে কি-না। যখন

শুনিলেন তাঁহারা কিছুই খান নাই (মা খান নাই বলিয়া) তখন তিনি একটু দুধ ও দুখানি লুচি খাইলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মণীন্দ্র ও প্রভাকর মায়ের কাছে গিয়েছেন। মাকুর ছেলের মৃত্যুতে মায়ের মন বিষণ্ণ। তাহারই কথা হইতেছে।

মা—সে বলতো, ফুল লাল করেছে কে? আমি বলতুম, 'ঠাকুর করেছেন।'—'কেন?'—'তিনি পরবেন বলে।'...

"শরতের খুব লাগবে। সর্ব্বদা কোলে করতো, যদিও তার পায়ে ব্যথা। কোলে বসে বলতো, 'তোমার মা কোথায়?' শরৎ মাকুকে দেখিয়ে বলতো, 'এই যে আমার মা।' ছেলে বলতো, 'তোমার মা স্কুল বাড়ীতে গেছে'।"

ঐ সময় রাধুর অসুখের জন্য মা তাহাকে লইয়া কিছুদিন নিবেদিতা-স্কুল-বোর্ডিংএ ছিলেন। 'উদ্বোধনে'র বাড়ীতে গোলমাল রাধুর সহ্য হইত না।

মণীন্দ্র—অক্ষয়ের মৃত্যুতেও ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

মা—তিনি বলেছিলেন, 'গামছা যেমন মোচড় দেয় তেমনি হয়েছিল।' আমার এক ভাসুরপো (জ্ঞাতির ছেলে) দীনু বলে বিষ্ণু-ঘরে পূজো করতো। হৃদয়

কালীঘরে পূজো করতো। দীনু 'যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি'—এই সব গান ঠাকুরকে শুনাতো। তার কলেরা হয়েছিল।"

মণীন্দ্র—আপনি তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন?

মা—হ্যাঁ, আমি নবতে ছিলুম। ঠাকুরের পায়ের ধূলো, আমার পায়ের ধূলো, মা কালীর স্নানজল দিয়েছিলুম। তা বাঁচলো না—মারা গেল। ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

"আমার ছোট ভাই এণ্ট্রাস পাশ করেছিল—বেশ লেখাপড়া শিখছিল, ডাক্তারী পড়ছিল। নরেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নরেন বলেছিল, 'মার এমন ভাই আছে? সব তো চালকলাবাঁধা বামুন।' নরেন বললে, 'পেটের ভিতর ফোঁড়া হবে, তোমাকে তা কাটতে হবে। যোগেন, তুমি এর পড়বার খরচ জোগাবে।' যোগেন মারা গেল। রাখাল ৪০৲ টাকার বই কিনে দিয়েছিল। রাখাল, শরৎ তার সঙ্গে একসঙ্গে তাস খেলতো। সে ভাই মারা গেল।

"সংসার মায়ার বন্ধন। …(করুণ স্বরে) আহা! যাকে পাশ ফিরে শুইয়ে মনে প্রত্যয় হয় না, এমন ছেলে মাকুর! দেখ না কত যন্ত্রণা!

"এই রাধুকে লালনপালন করে কত কষ্ট—পালার বড় জ্বালা! রাধু যখন হয়, মা বলেছিলেন, 'ছোট বউকে

ওর মা-বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়, তা যাক্ না।' আমি সকালবেলা পূজোর সময় দেখলুম (কলিকাতায় ঠাকুরপূজা করিবার সময়) থিয়েটারে যেমন পর্দা (drop-scene) এইরূপে (দুই হাত মেলিয়া দেখাইয়া) সরে যায়, সেইরূপ দেখেছিলুম—দেশে রাধুর মা খুব কষ্ট পাচ্ছে, রাধুকে শুধু চারিটি মুড়ি দিয়েছে, বাইরে উঠানে পড়ে খড় ধূলোর উপরে সে মুড়ি খাচ্ছে। রাধুর মা হাতে কোথাও একটা লাল সুতো, কোথাও নীল সুতো বেঁধেছে—পাগলের যেমন খেয়াল। অন্য সব ছেলেরা মুড়িটুড়ি মিষ্টি দিয়ে খাচ্ছে—এই দেখে জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন হাঁপিয়ে ওঠে তেমনি হাঁপিয়ে উঠলুম, বুঝলুম—আমি ছেড়ে দিলে রাধুর ঐ অবস্থা।"

শ্রীশ্রীমা তাঁহার ছোট ভাই অভয়কে খুব ভাল বাসিতেন। ভাইদের তিনিই মানুষ করিয়াছেন। অভয় মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিল, "দিদি, সব রইল—দেখো।" রাধু তখন মাতৃগর্ভে। প্রসবের পর রাধুর মা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কলিকাতায় আসেন। পরে পাগল হইলে তাঁহাকে জয়রামবাটী পাঠান হয়। রাধু সেখানে খুব দুঃখকষ্ট পাইতে থাকে। শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থানকালে একদিন সকালবেলা পূজা করিবার সময় জয়রামবাটীর এই চিত্র (vision) দেখেন

এবং অভয়ের অন্তিম কথা স্মরণ করিয়া দু-চার দিনের মধ্যেই দেশে গিয়া রাধুর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। মা বলিতেন, "সেই হতেই আমাকে মায়ায় ধরলো।" আর একবার কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের খুব অসুখ। তখন হঠাৎ রাধু শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া জয়রামবাটী চলিয়া আসে। মাকে বলিয়াছিল, "তোমাকে দেখবার কত ভক্ত আছে, আমার স্বামী ছাড়া আর কে আছে?" মা এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "কাল রাধু ত অমন করে আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল। মনে ভয় হল, ভাবলুম—ঠাকুর কি তা হলে আমাকে এবার রাখবেন না?" মা আরও বলিয়াছিলেন, "এই যে 'রাধি রাধি' করি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বই তো নয়!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। মণীন্দ্র ও প্রভাকর বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাত্রেই তাঁহারা আরামবাগ যাইবেন।

মা বলিলেন, "তোমরা একটু কিছু খাও।"

প্রভাকর—আমরা খেয়ে এসেছি।

মা—একটু খাও না কেন? ওগো, একটু মিষ্টি এনে দাও তো।

পরে আমাদের বলিলেন, "তোমরা খাওয়াদাওয়া করে যেও।"

মণীন্দ্র—আচ্ছা, মা।

মা—গাড়ী হয়েছে ?

মণীন্দ্র—হয়েছে।

প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণের সময় মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবানে মতি হোক।"

মণীন্দ্র—মা, আমাদের মায়া যেন কাটে।

মা এ কথায় প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

২৩শে এপ্রিল

ভক্তেরা মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। নারায়ণ আয়াঙ্গার মাকে বলিলেন, "মা, আপনার মনে এখন অশান্তি (মাকুর ছেলের মৃত্যুতে), আমি সেজন্য শীঘ্র রওনা হব মনে করছি।"

মা বলিলেন, "সুখ-দুখ আর কোথায় যাবে। এরা তো আছেই। তোমার তাতে কি ? তুমি এখন থাক। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ৪ঠা, ৫ই তারিখে যাবে।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩২৬

স্বামী শান্তানন্দ ও স্বামী হরানন্দ কাশী হইতে আসিয়াছেন। মণীন্দ্রও পুনরায় আসিয়াছেন। সকালে শান্তানন্দ ও মণীন্দ্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে থাকেন, মা 'জগদম্বা আশ্রমে'।

শান্তানন্দ—মা, আপনার শরীর কেমন আছে ?

মা—ভালই আছি।

Internment (রাজদ্রোহিতার সন্দেহে আটক) হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছেলে পূর্ব্বদিনে আসিয়াছে। পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে ভক্তেরা তাহাকে তখনি বিদায় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ওকে রেখে দাও; আজ থাক, কাল যাবে।" স্বামী কেশবানন্দ তাহাকে মঠে না রাখিয়া অন্যস্থানে রাখিয়াছিলেন। কারণ, তখনও রোজ রাত্রে চৌকিদার আসিয়া নবাগত ভক্তদের নামধাম লিখিয়া লইত। পরদিন মা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সেই ছেলেটি কোথায় ? চলে গেল না-কি ?"

মণীন্দ্র—সে আছে। আজ খাওয়াদাওয়া করে যাবে।

মা—(শান্তানন্দকে) রাত্তিরে কোথায় ছিল ?

শান্তানন্দ—জানি না মা, আমাদের জানায় নাই।

মা—এখানে যখন জল হয়, কাশীতেও কি সেই সময় জল হয় ?

শান্তানন্দ—না মা, শ্রাবণ মাসে সেখানে বর্ষারম্ভ। তবে কখনো কখনো বৈশাখ মাসে ঝড় হয়ে আমটাম নষ্ট করে দেয়।

"কাশীতে যারা মরবে বলে যায়—বুড়ীরা, তাদের মা, বড় কষ্ট। হয়তো বাড়ী থেকে টাকা পাঠাত, বন্ধ করে দিয়েছে। নীচের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়।"

মা—হ্যাঁ, বুড়ীদের খুব কষ্ট দেখেছি, যখন কাশীতে বংশীদত্তের বাড়ীতে ছিলুম। সামান্য চাল ভিক্ষে করে এনে হয়তো ভিজিয়েই তা খেয়ে ফেলতো, রাঁধতো না।

শান্তানন্দ—বুড়ীরা মরতে গিয়ে আবার দীর্ঘজীবী হয়।

মা—বিশ্বনাথ-দর্শন-স্পর্শনে পাপক্ষয় হয়, তাইতেই দীর্ঘজীবী হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায় দেয়, প্রসাদ খাওয়ায় বলে দীর্ঘজীবী হয়।

মা এবার রাধুর কথা বলিতেছেন, "রাধু একটু দাঁড়াতে পারলে হয়। ঘরেই শৌচাদি করছে। এ ভাবে আমাকে আর কদিন রাখবেন, ঠাকুর যে কি করবেন, জানি না।"

মা শান্তানন্দ স্বামীকে, মাকুর ছেলের কথা বলিতেছেন, "শোকে মানুষকে যা জব্দ করে এমন আর কিছুতেই পারে না। শরতেরও তার জন্যে খুব কষ্ট হয়েছে। কালো ঔষধ আনতে কলকাতা গেল। এরা আবার তাকে

বলে দিচ্ছিল শরতের সঙ্গে যেন দেখা না করে। আমি বলি, 'কলকাতা যাবে, শরতের সঙ্গে দেখা করবে না—কি রকম কথা'?"

মণীন্দ্র—হ্যাঁ, শরৎ মহারাজ লিখেছিলেন—কালো যেন সটান আমার কাছে আসে।

মা তরকারি কুটিতেছিলেন। চেলো (ফল) দেখিয়া শান্তানন্দ স্বামী বলিলেন, "এ কলকাতায় পাওয়া যায় না।"

মা—এতে ছেঁচ্‌কি হয়, অম্বলে দেওয়া চলে, ঠাণ্ডা গুণ, ভাল জিনিস। (মণীন্দ্রকে) জাহানাবাদে পাওয়া যায়?

মণীন্দ্র—হ্যাঁ মা।

শান্তানন্দ স্বামী মায়ের নিকট দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা তুলিলেন।

শান্তানন্দ—ইনফ্লুয়েঞ্জাতে শুনছি যাট লক্ষ লোক মরেছে। ধান চাল সব দুর্ম্মূল্য—লোকের বড় কষ্ট।

মা—হ্যাঁ বাবা। লোকে খেতে পাচ্ছে না আবার যার ঘরে ছেলেপিলে আছে তার আরও কষ্ট। এই তো কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। বর্ষা হয়ে ধানচাল হলে তবে তো কষ্ট যাবে। কে সাহেব না-কি এসেছিল কলকাতায়

—যেখানকার ধান চাল সেখানে থাকবে, আইন করবে বলে ; সে না-কি চলে গেছে।

মণীন্দ্র—সেরূপ তো চেষ্টা হচ্ছে।

শান্তানন্দ—লোকের কষ্ট তো দিন দিন বাড়ছে। এত কষ্ট দেশে! এ কি মা, কর্ম্মফল?

মা—এত লোকের কি কর্ম্মফল? কি একটা হাওয়া এসেছে।

শান্তানন্দ—যুদ্ধ থেমে গেছে, তবু জিনিসপত্র সস্তা হচ্ছে না কেন?

মা—তবে যে বলে, আবার যুদ্ধ হচ্ছে?

শান্তানন্দ—সে এখানে—কাবুলে। এত দুঃখকষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ! এ কি মা যুগপরিবর্ত্তন হবে আবার?

মা—(হাসিয়া) কি করে বলবো? তাঁর ইচ্ছায় কি হবে কেমন করে জানবো? রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। হিংসা, খলতা, ব্রহ্মহত্যা—এই সব পাপ; রাজার পাপে প্রজার কষ্ট ও দৈব-উৎপাত—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ। সবাই একটু নরম হলে তো যুদ্ধ থেমে যায়।

"আহা, ভারতেশ্বরী (ভিক্টোরিয়া) কেমন ছিলেন! লোকে কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। এখন একটি পাঁচ

বছরের ছেলে—সেও দুঃখের কথা বোঝে, বলে আমার পরবার কাপড় নেই। আচ্ছা, শরৎ যে এখানে চাল-দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কতগুলি চাল দেওয়া হল ?”

মণীন্দ্র—কত তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। তবে প্রতি সপ্তাহে চৌত্রিশ টাকার চাল দেওয়া হয়।

মা—কত করে পাচ্ছে ?

মণীন্দ্র—জন প্রতি এক পোয়া হিসাবে।

মা—প্রত্যেকে কত পেলে ?

মণীন্দ্র—ছয় সের, সাত সের, আট সের যাদের যেমন লোক খেতে।

মা—কতগুলি লোক পেলে ?

মণীন্দ্র—ঠিক জানি না, মুসলমানের মেয়েরাই বেশী ভিখারী।

মা—হ্যাঁ, এখানে মুসলমানেরা গরীব বেশী। আচ্ছা, শরৎ আর কোথায় চাল দিচ্ছে ?

মণীন্দ্র—বাঁকুড়া, ইন্দপুর, মানভূম। যেখানে দুর্ভিক্ষ সেখানে দিচ্ছেন।

মা—ছেলেরা যাচ্ছে সেখানে ?

শান্তানন্দ—মঠ থেকে যাচ্ছে।

মণীন্দ্র—ইন্দপুর, যেখানে সাতুর যাবার কথা হয়েছিল।

মা—সাতুর ভগ্নীটির শিওড়ে বিবাহ হয়েছে।

মণীন্দ্র—হ্যাঁ মা; সাতু বিবাহে না যাওয়ায় তার বাপ মা—

মা—হ্যাঁ, বড় দুঃখিত হয়েছে; তা হবেই তো, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ বিয়েতে যাবে কেমন করে? অন্য সময় যাবে বই কি।

"প্রভাকরের ছেলেটি ভাল হলে হয়। ছেলে হওয়া এক পাপ। তিনি বলতেন—সংসারে সব ভেল্কিবাজি। ভেল্কিবাজি বটে, তবে মনে থাকে না এই-ই দুঃখ।"

১৬ই আষাঢ় বৈকালে মণীন্দ্র, প্রভাকর, শ্যামবাজারের প্রবোধ বাবু প্রভৃতি মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। প্রণাম করিতেই মা প্রভাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে ভাল আছে তো? অসুখ করেছিল।"

প্রভাকর—ভাল আছে।

মা—তোমরা কতক্ষণ এলে? ভাত খাওয়া হয়েছে?

প্রভাকর—হয়েছে।

মণীন্দ্র ও প্রবোধ বাবু নিবেদিতা-স্কুলে মেয়েদের ভর্ত্তি করিয়া দিতে ইচ্ছুক।

সে কথা উত্থাপন করিয়া মায়ের অনুমোদন প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন, "বেশ তো, শরৎকে লেখ।"

প্রবোধ বাবু—তাঁকে লেখা হয়েছে।

স্ত্রী-ভক্তদের কে একজন বলিলেন, "থাকতে পারবে কি? ছেলে মানুষ।"

মা—খুব পারিবে। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা ছ-সাত বছর বয়স, থাকে তো? তাদের মা বাপ নিতে এলেও যেতে চায় না।

প্রবোধ বাবু—আজ গ্রাম দেখতে গিয়েছিলুম। খুব কষ্ট লোকদের। পরনের কাপড় নেই—আমাদের সামনে বেরুতে পারলে না। চালে খড় নেই। (প্রবোধ বাবু প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত)।

মা—তাদের চাল দেওয়া হল কি?

প্রবোধ বাবু—কাল রবিবারে দেওয়া হয়েছে।

মা—কাপড় দেওয়া হয় কি?

প্রবোধ বাবু—বেছে বেছে দেওয়া হয়।... মা, আপনি কি এক স্বপ্ন দেখেছিলেন শুনেছি—একটি স্ত্রীলোক কলসী ও ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

মা—হ্যাঁ, একটি মেয়ে একটা কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কে গো? সে বললে—আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব। আমি বললুম—তারপর কি হবে? সে বললে—অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব। তাই বুঝি হচ্ছে। মার মুখে শুনতুম যে, যখন হয় উপর উপর তিন বছর দুর্ভিক্ষ হয়। দু বছর হয়েছে কি?

মণীন্দ্র—যুদ্ধ তো অনেক দিন হচ্ছে।

মা—যুদ্ধ তো চার-পাঁচ বছর হচ্ছে। তা নয়, দুর্ভিক্ষ কি দু বছর হয়েছে? তা হলে আর এক বছর হবে।

"এখন ধানের দাম কত?"—মা জিজ্ঞাসা করলেন। ও দেশের হিসাবে মূল্য বলা হইল।

মা বলিলেন, "এত দাম? আর সব জিনিসই—কাপড়, তেল এ সব ত খুব চড়েছে। যাদের আছে, তাদেরও চিন্তা-ভাবনা। এবার 'তোমার চামড়া আমি খাব, আমার চামড়া তুমি খাবে।'

"তিনি যত দুঃখকষ্ট দিচ্ছেন, তা তো বুক পেতে নিতে হবে। ভগবান যা করবেন তাই হবে।"

প্রবোধ বাবু—মা, আপনাকেই যখন এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তখন আর কারুরও কি পরিত্রাণ আছে?

মা—আমাকে ঠিক যেন খাঁচায় পূরে রেখেছে। নড়বার চড়বার জো নেই—কোনো দিকে পালাবার উপায় নেই।

প্রবোধ বাবু—কামারপুকুরে আবার গোলমাল হচ্ছে ঠাকুরের জায়গা নিয়ে।*

---

* ঠাকুরের জন্মস্থানে মন্দির করিবার জন্য যে নূতন জমি কেনা হইয়াছে তাহা লইয়া তখন গোলমাল হইতেছিল।

মা—কে গোলমাল করছে? মহিম বাবু?

প্রবোধ বাবু—না, ফকির বাবু আর হেম বাবু।

মা—আচ্ছা, গোলমালে কাজ কি? বেড়া সরিয়ে নিলে কি হয় না?

প্রবোধ বাবু—আমি ত খুঁটো চারদিকে পুঁতে দিয়ে এসেছি। মহিম বাবু রাস্তার উপর মাটি পড়াতে বরং সন্তুষ্ট। আমাদের আরও খানিকটা এগিয়ে খুঁটো পুঁতলে ভাল হতো। তারপর যত আপত্তি করতো, ক্রমশঃ সরিয়ে আনা হোত। যেমন ব্যবসাদার, তেমনি ব্যবসাদারী বুদ্ধি দরকার।

মা এই আশ্চর্য্য ব্যবস্থা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

প্রবোধ বাবু—শরৎ মহারাজকে লিখেছি। তিনি যেমন বলবেন তেমনি করবো।

মা—পূর্ব্বে মুনিষের (মজুরের) দাম চার পয়সা ছিল। আমার মনে আছে, এতখানা একটা কাগজে লিখে কলকাতায় লোক পাঠাতো। সে হেঁটে যেতো। তখন ডাক ছিল না।

প্রবোধ বাবু—এখন ডাক হয়ে কিন্তু সুবিধা হয়েছে, মা।

মা—তা হয়েছে। পূর্ব্বে যা ছিল তাই বলছি। এক

টাকায় অনেক তেল পাওয়া যেতো। এখন ধান এক আঁজলাতেই টাকা বলে। সকলে ধান বেচে দিচ্ছে, টাকা বেশী পাওয়া যায় কি-না! বাকী সামান্য যা থাকছে তাও তো রাখতে পারবে না, কেন না পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খেতে হবে ত?

"প্রসন্ন (বড় মামা) চার-পাঁচ শ টাকার ধান বেচে দিলে। তার কিছু ধান চুরি গিয়েছিল। রাজ ঘোষও ধান বেচে ফেলেছে। তার অনেক ধান। তাকে না-কি চিঠি দিয়েছিল—'তুমি এত টাকা দাও, না হলে তোমার বাড়ীতে চুরি হবে।' সে পুলিশে চিঠি দেখিয়েছিল, বোধ হয় গ্রামের দুষ্ট লোকে ঐরূপ করছে।"

মণীন্দ্র ও প্রবোধ বাবু পরদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। প্রবোধ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জোর করে সংসার ত্যাগ করা চলে?"

মা এ কথায় সস্মিত মুখে অমনি উত্তর দিলেন, "লোকে তো করছে গো।"

প্রবোধ বাবু—মহামায়ীর প্রসন্নতা লাভ না করে যদি নিজের খেয়ালে কেউ সংসার ত্যাগ করে, তা হলে বোধ হয় গোল বাধে।

মা—ঘরে ফিরে আসে।

* * *

মণীন্দ্র—স্বামিজীও খুব কষ্ট করেছিলেন। তিনি কিন্তু উতরে গেলেন—শরীরে সয়ে গেল।

মা—না, তাঁকেও খুব ভুগতে হয়েছে, পেচ্ছাবের অসুখ। সর্ব্বদাই গা জ্বালা করতো। তবু খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়েছিলেন।

মণীন্দ্র—মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল?

মা—মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে নি। এত পরিশ্রম করেছিলেন যে রক্ত-ওঠা পরিশ্রম।

প্রবোধ বাবু—শুনেছি, স্বামিজী হরি মহারাজের গলা ধরে কেঁদেছিলেন দার্জ্জিলিং-এ—'ভাই, তোমরা শুধু তপস্যা নিয়ে থাকবে—আমি একা প্রাণ বার করছি!'

মা—হ্যাঁ বাবা, তিনি (স্বামিজী) নিজের দেহের রক্ত দিয়েছিলেন পরের জন্যে। নরেনই তো বিলাত থেকে ফিরে এসে এই সব করলে। তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে। এখন বিলাতে (বিলাত বলিতে শ্রীশ্রীমা আমেরিকা বুঝিয়াছিলেন) চার জন ছেলে আছে?

প্রবোধ বাবু—হ্যাঁ; স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ।

মা—কালীর নামটি কি?

মণীন্দ্র—স্বামী অভেদানন্দ।

৭৪৪

মা—বসন্ত (স্বামী পরমানন্দ) এখানে চিঠিপত্র লেখে, টাকা-কড়ি পাঠায়। সেখানে বক্তৃতা দেয়।...যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) খুব কঠোর করেছিল, তীর্থে গিয়ে আঁজলা (অঞ্জলি) করে জল খেত। রুটী শুকিয়ে গুঁড়িয়ে রেখে দিত। তাই কিছু কিছু খেত। তাতে খুব পেটের অসুখ করে। তাইতেই ভুগে ভুগে দেহ গেল।... সংসারে কি সুখ আছে? এই আছে, এই নাই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জেরে ফেলে। তবে যারা সংসার করে ফেলেছে, তারা আর কি করবে। বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া মঠে (কোয়ালপাড়া-মঠে) ফিরিলেন। বৈকালে আবার মণীন্দ্র ও প্রবোধ বাবু শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়াছেন।

প্রবোধ বাবু—শরৎ মহারাজ পত্রের উত্তর দিয়াছেন, পড়বো মা?

মা—পড়।

প্রবোধ বাবু চিঠি পড়িয়া মাকে শুনাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে এই লেখা ছিল—"আমার মত হইলে কি হইবে। বীণাকে (প্রবোধ বাবুর মেয়ে) এখানে রাখা সম্বন্ধে ঠাকুরের ইচ্ছা অন্যরূপ।"

মা—তাই তো, এমন কথাটা কেন লিখলে বল

দেখি? একেবারে কাটিয়ে লিখে দিয়েছে। তা বোধ হচ্ছে—সুধীরার মত নেই। সুধীরা বলেছিল, 'মা, আর পারি নে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।' মেয়েদের জন্যে সে কত কষ্ট করে। যখন খরচ আর চলে না, বড়লোকের মেয়েদের গানবাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০।৫০ টাকা আনে। স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে—সেলাই করা, জামা তৈরী করা। সে বছর তিনশ টাকা লাভ হয়েছিল। ঐ টাকায় ওরা হেথা সেথা যায়—পূজোর সময়। সুধীরা দেবব্রতের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভগ্নী। ভাই নিজে ষ্টেসনে আড়ালে থেকে ভগ্নীকে টিকিট কাটতে, একলা গাড়ীতে উঠতে—এ সব শিখাতো।

"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা, তারা সব কেমন কাজকর্ম্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে—'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!' আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হোত, তা হলে কি এত দুঃখ-দুর্দ্দশা হতো!"

শ্রী—

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইবার কিছুদিন পরে একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি— খাইয়া যাইতে পারি নাই। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আহা, তুমি খাওনি, নহবতে যাও, সেখানে ভাত-তরকারি আছে, খাও গে।" নহবতে মায়ের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হইল। রামের মা প্রভৃতির সঙ্গে দুই-একবার মায়ের পরিচয় হইয়াছিল। তাহারা মাকে বলিল যে, আমি খেয়ে যাই নি। মা অমনি তাড়াতাড়ি ভাত তরকারি লুচি প্রভৃতি যা ছিল আমায় খাইতে দিলেন। সেই প্রথম দেখাতেই মায়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। ইহার পর রামলাল দাদার বিবাহের সময় মা যেদিন দেশে যাইবেন সেই দিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। অনেক দিন মায়ের সহিত দেখা হইবে না ভাবিয়া আমার মনে খুব কষ্ট হইল। যাইবার সময় মা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিলেন। উত্তরের বারান্দায় ঠাকুর গিয়া দাঁড়াইলে মা প্রণাম করিলেন, পায়ের ধূলা লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সাবধানে যাবে। নৌকায় রেলে কিছু ফেলে টেলে যেয়ো না।" মা ও ঠাকুরকে সেই আমি এক সঙ্গে দেখি। তাঁহাদিগকে একত্রে
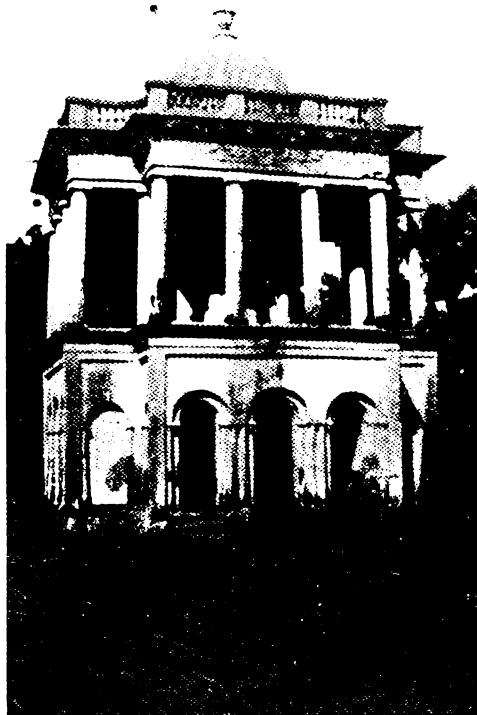
দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানা

ইহারই নীচের ঘরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন

শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির
জয়রামবাটী

দেখিতে আমার সাধ ছিল। মা নৌকায় রওনা হইলেন। যতদূর দেখা গেল আমি নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। নৌকা অদৃশ্য হইলে নহবতে মা যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেখানে বসিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম। নহবতের পশ্চিম ধারের বারান্দায় দক্ষিণ-মুখে বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। ঠাকুর এদিকে আসিবার সময় আমার কান্না শুনিতে পাইয়াছিলেন। নিজের ঘরে গিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইলে তিনি বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?" এই বলিয়া আমায় যেন ভুলাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে-সব সাধনা করিয়াছিলেন সেই-সব কথা বলিতে লাগিলেন; বলিলেন, "এ-সব কারুকে বোলো না।" ঐ দিন ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইল। বৌ-মানুষ—এতদিন সঙ্কোচ ছিল। প্রায় দেড় বৎসর পরে মা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, "আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে।" মা আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই যে ডাগর-ডাগর-চোখ মেয়েটি আসে সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন সে নহবতে বসে খুব কেঁদেছিল।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম যোগেন।" আমি যখনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম মা আমাকে সব কথা

বলিতেন; পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতাম। আমার হাতের চুলবাঁধা মা এত ভালবাসিতেন যে, তিন-চার দিন পরেও স্নানের সময় মাথার চুল খুলিতেন না; বলিতেন, "না, ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই দিন খুলবো।" আমি সাত-আট দিন পর পর ঠাকুরের কাছে যাইতাম। দক্ষিণেশ্বর হইতে শিবপূজার জন্য বেলপাতা লইয়া আসিতাম, সেই সব বেলপাতা শুকাইয়া গেলেও সেই শুকনো বেলপাতা দিয়াই শিবপূজা করিতাম। একদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন, তুমি শুকনো বেলপাতায় পূজো কর কি?"

"হ্যাঁ মা, তুমি তা কি করে জানলে?"

"আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম যে তুমি শুকনো বেলপাতায় পূজো করছ।"

একদিন নহবতে বসিয়া মা পান সাজিতেছিলেন, আমি পাশে বসিয়া দেখি—মা কতকগুলি পান ভাল করিয়া এলাচ দিয়া সাজিলেন, আর কয়েকটা শুধু সুপারি-চুন দিয়া সাজিলেন। আমি বলিলাম, "কই এগুলিতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগুলি বা কার, এইগুলিই বা কার?"

মা বলিলেন, "যোগেন, এগুলি (ভালগুলি)

ভক্তদের, এদের আমাকে আদরযত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। আর ওগুলি (এলাচ-না-দেওয়াগুলি) ওঁর জন্যে, উনি তো আপনার আছেন-ই।"

মা বেশ গাহিতে পারিতেন। লক্ষ্মীদিদি ও মা একদিন রাত্রিতে মৃদু গলায় গান করিতেছিলেন। বেশ জমিয়াছে —ঠাকুর তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরদিন বলিতেছেন, "কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ, ভাল।"

দক্ষিণেশ্বরে সমস্ত দিন মায়ের একটুকুও বিশ্রামের সময় ছিল না। ভক্তদের জন্য তিন সের—সাড়ে তিন সের আটার রুটি হইত। পানই সাজিতেন কত! তারপর ঠাকুরের দুধ খুব ঘন করিয়া জ্বাল দিতেন; কারণ ঠাকুর সর ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্য ঝোল হইত। ঠাকুরের মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ঠাকুর ততদিন নহবতে খাইতেন। ঠাকুরের মা শরীর রক্ষা করিবার পর তিনি নিজের ঘরেই খাইতেন। ছেলেরা কেহ না থাকিলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া দিতেন। গোলাপদিদি আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে ভাতের থালা আনিতে বলেন। তদবধি গোলাপদিদি প্রত্যহই ভাত লইয়া যাইত। ভাত দিতে গিয়া মা রোজ ঠাকুরকে একবারটি দেখিতে পাইতেন, এইরূপে তাহাও

বন্ধ হইল। গোলাপদিদি সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ ঠাকুরের কাছে থাকিত, কোন দিন হয়তো রাত দশটার সময় নহবতে ফিরিত। নহবতের বারান্দায় মাকে গোলাপ-দিদির খাবার লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত, সেই জন্য তিনি একটু অসুবিধা বোধ করিতেন। একদিন ঠাকুর শুনিতে পাইয়াছিলেন—মা বলিতেছেন, "খাবার বিড়াল-কুকুরে খায় খাক, আমি আর আগলাতে পারবো না।" পরদিন ঠাকুর গোলাপদিদিকে বলিলেন, "তুমি এত-ক্ষণ থাক, ওর কষ্ট হয়। ওকে খাবার আগলে থাকতে হয়।" গোলাপদিদি বলিলেন, "না, মা আমাকে খুব ভালবাসেন, মেয়ের মত নাম ধরে ডাকেন।" গোলাপ-দিদির জন্য ঠাকুরের কাছে আসিবার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় মা যে দুঃখিতা, একথা গোলাপদিদি বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন গোলাপদিদি মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, মনো-মোহনের মা বলছিল—'উনি অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ী-টাকড়ী এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি ?' "

পরদিন সকালে আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখি—কেবল হাতে সোনার বালা দুগাছি রাখিয়া মা আর সব গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন। আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, একি ?"

মা বলিলেন, "গোলাপ বললে—।"

আমি অনেক বুঝাইতে তবে মা মাকড়ী আর সামান্য দুই-একটি গহনা পরিলেন। সেই যে গহনা খোলা হইল আর পরা হইল না। কারণ, তার পরই ঠাকুরের অসুখ আরম্ভ হইয়াছিল।

মা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি সংসারের বিশেষ কিছুই বুঝিতেন না এবং ভাবটাবও হইত না। নিষ্ঠার সহিত ভগবানের নিত্য জপ-ধ্যান করিলেও তাঁহার ভাব-সমাধি হইত এ কথা আমরা শুনি নাই। বরং ঠাকুরের ভাব হইতে দেখিলে মা বড়ই ভীতা ও চিন্তিতা হইয়া পড়িতেন। কারণ মায়ের মুখেই শুনিয়াছি—দক্ষিণেশ্বরে মা যেবার প্রথম আসেন, রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেন *। তখন মা ও ঠাকুর এক ঘরেই শুইতেন, ঠাকুর বড় তক্তাপোশে আর মা ছোট খাটটিতে। মা বলিতেন, "সমস্ত রাত ঠাকুরের ভাব হোত, তাই

---

* তোতাপুরী এক সময় ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কামজয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে কাছে রেখে দাও তবে তো বুঝবো।" ঠাকুর তাই আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে মা প্রথম যেবার আসেন সেবার রাত্রিতে তাঁহার সহিত এক শয্যায় আট মাস একত্রে শয়ন করিয়াছেন।

দেখে আমার ঘুম হোত না। ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতুম, ভাবতুম—রাত কখন পোহাবে। একদিন ভাব আর ভাঙ্গে না। তখন অস্থির হয়ে কালীর মাকে (ঝি) দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে নাম শুনাতে তবে ভাব ভাঙ্গে। পরদিন ঠাকুর যে রকম ভাব দেখলে যে মন্ত্র শুনাতে হবে আমায় সব শিখিয়ে দিলেন।"

আমার সহিত মায়ের পরিচয় হইবার কিছুদিন পরে একদিন মা আমাকে বলিলেন, "ওঁকে বোলো যাতে আমার একটু ভাবটাব হয়, লোকজনের জন্য ওঁকে এ কথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে না।"

আমি ভাবিলাম হবেও বা; মা যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিব। পরদিন সকালে ঠাকুর একা তক্তাপোশে বসিয়া আছেন দেখিয়া আমি প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মায়ের কথা বলিলাম। তিনি ঐ কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তিনি যখন ঐরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, তখন কথা বলিতে কাহারও সাহস হইত না। তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। নহবতে আসিয়া দেখিলাম—মা পূজা করিতেছেন। দরজা একটু খুলিয়া

দেখি—মা খুব হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থা। আমি ইহা দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ পর পুনরায় যাইতে মা বলিলেন, "(ঠাকুরের কাছ থেকে) এই এলে?" তখন আমি বলিলাম, "তবে মা, তোমার না-কি ভাব হয় না?" মা তখন লজ্জা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন। ঐ ঘটনার পর আমি দক্ষিণেশ্বরে কখন-কখনও রাত্রিতে মায়ের কাছে থাকিতাম। আমি আলাদা শুইতে চাহিলে মা কিছুতেই শুনিতেন না, আমায় কাছে টানিয়া লইয়া শুইতেন। একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর স্বরে মায়ের ভাব হইল, থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম—আমি সংসারী মানুষ, ওঁকে এই সময় ছোঁবো না। অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাব উপশম হইল।

মা বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছাতে বসিয়া একদিন ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। হুঁশ আসিতে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদর যত্ন করছে।

আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে। সে যে কি আনন্দ বলতে পারি নে! একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকবো। ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতেও ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এলো।"

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপদিদি ছাতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও এক ভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দনহীন, সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই—পা কই?" আমরা মায়ের হাত ও পা টিপিয়া দেখিতে লাগিলাম—এই যে পা—এই যে হাত; তবুও দেহটা যে রহিয়াছে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা উহা বুঝিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে কালা বাবুর কুঞ্জে একদিন সকালে ধ্যান করিতে করিতে মায়ের সমাধি হইল। সমাধি কিছুতেই আর ভাঙ্গে না। আমি অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙ্গিল না। শেষে যোগেন স্বামী আসিয়া নাম শুনাইবার পর সমাধির একটু উপশম

হইলে ঠাকুর সমাধিভঙ্গের সময় যেরূপ বলিতেন, মা সেইরূপেই বলিলেন, "খাব"। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইলে ঠাকুর ভাবাবেশে যেরূপে খাইতেন মা সেইরূপে ঐ সকল একটু একটু খাইলেন। পানটি পর্য্যন্ত ঠাকুর যে ভাবে সরু দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন। তখন তাঁহার ভাব-ভঙ্গি খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাব সম্পূর্ণ উপশম হওয়ার পর মা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর ঐ সময় ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল। যোগেন স্বামী মায়ের ঐরূপ ভাবাবস্থার সময় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ঠাকুর যেরূপ উত্তর দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েকদিন পরেই রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তেরা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া কাশীপুরের বাগানবাড়ী হইতে বাসা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন, সেই জন্য মাকে বলরাম বাবুর বাড়ীতে আনা হইল। তারপর মা তীর্থদর্শন-মানসে যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতির সঙ্গে কাশী আসেন। কাশীতে আট-দশ দিন থাকিবার পর বৃন্দাবনে আসিয়া কালা বাবুর কুঞ্জে প্রায় এক

বৎসর ছিলেন। ঠাকুরের দেহ যাইবার দুই-এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি বৃন্দাবন গিয়াছিলাম। বৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হইতেই মা শোকাবেগে "যোগেন, গো" বলিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম দেখা। বৃন্দাবনে মা প্রথম প্রথম খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এ ঘর, আর ও ঘর।"

বৃন্দাবনে থাকিবার সময় পত্রপুষ্পে সাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন একটি শবদেহ লইয়া যাইতেছিল। মা উহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, মানুষটি কেমন বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মরতে এলুম, তা একদিন একটু জ্বরও হলো না! কত বয়স হয়ে গেল বল দেখি, আমার বাপকে দেখেছি, ভাশুরকে দেখেছি!" আমরা শুনে হাসি আর বলি, "বল কি মা, বাপকে দেখেছ! বাপকে আবার কে দেখে না?" এমনি ছেলেমানুষের মত কথা মা তখন বলিতেন। প্রথম প্রথম যেমন ঠাকুরের জন্য খুব কাঁদিয়াছিলেন, শেষে কিন্তু ঠাকুর

তেমনি আনন্দে মাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন মাকে দেখিলে যেন একটি বালিকা বলিয়া মনে হইত। নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেন। একদিন রাধারমণ দেখিতে গিয়া মা দেখিয়াছিলেন—যেন নবগোপাল বাবুর স্ত্রী রাধারমণের পাশে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। তাই দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া মা আমাকে বলিলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এই রকম দেখলুম।"

বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দকে) এই মন্ত্র দাও।" প্রথম দিন মা ঐ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ দেখিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে মা ঠাকুরকে বলেন, "আমি তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কই না, কি করে মন্ত্র দিই।"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি মেয়ে-যোগেনকে (আমাকে) বলো, সে থাকবে।"

মা আমার দ্বারা যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কি-না। যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "না মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র

ঠাকুর আমায় দেন নাই। আমি নিজের রুচিমত একটি নাম জপ করি।” ঐ কথা জানিয়া মা তাঁহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষ-রক্ষিত কৌটা সম্মুখে রাখিয়া মা পূজা করিতেছিলেন। তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। পূজা করিতে করিতে মায়ের ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র দিলেন। এমন জোরে মন্ত্র বলিলেন যে পাশের ঘর হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম।

বৃন্দাবন হইতে মায়ের সহিত আমরা সকলে হরিদ্বার গিয়াছিলাম; যোগানন্দ স্বামী সঙ্গে ছিলেন। পথে রেলগাড়ীতে যোগেন মহারাজের ভীষণ জ্বর হয়। আমি তাঁহাকে বেদানা খাওয়াইতেছিলাম। মা দেখিয়াছিলেন, আমি যেন ঠাকুরকেই উহা খাওয়াইতেছি। যোগেন স্বামী জ্বরে বেহুঁশ হইয়া দেখিয়াছিলেন, ভীষণ এক মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে, ‘তোকে দেখে নিতুম, কিন্তু কি করবো, পরমহংসদেবের আদেশ—এখনই আমাকে চলে যেতে হবে, একদণ্ড আর থাকতে পারছি না।’ লাল-পেড়ে কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিল, ‘এই মাগীকে কিছু রসগোল্লা খাওয়াস্।’ আশ্চর্য্যের

বিষয় ঐ দর্শনের পরই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পরে হরিদ্বার হইতে আমরা জয়পুর গিয়াছিলাম। সেখানে গোবিন্দজী দর্শন করিয়া অন্যান্য বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক মন্দিরের পার্শ্বের এক মূর্ত্তি দেখিয়াই যোগানন্দ স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "এই মূর্ত্তিকেই রসগোল্লা খাওয়াতে বলেছিল।" আবার সামনে রসগোল্লার একটি দোকানও দেখা গেল। তখন আট আনার রসগোল্লা কিনিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ভোগ দেওয়া হইল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে উহা মা শীতলার মূর্ত্তি।

তারপর মা কলিকাতায় ফিরিলেন এবং বলরাম বাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া কামারপুকুর গিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর ভক্তেরা তাঁহাকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রায় ছয়মাস আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ)। পরে কার্ত্তিক মাসে ভাড়াবাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতে দুই-এক দিন থাকিয়া মা শ্রীক্ষেত্র (পুরী) যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে চাঁদবালি বড় জাহাজে, চাঁদবালি হইতে কটক ক্যানাল ষ্টিমারে এবং কটক হইতে গরুর গাড়ীতে পুরী যাওয়া হয়। শরৎ, রাখাল মহারাজ, যোগানন্দ স্বামী

প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। পুরী গিয়া বলরাম বাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর' বাড়ীতে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত থাকা হইয়াছিল। সামনের রোয়াকওয়ালা পাকা ঘরটিতে মা থাকিতেন। ঠাকুর জগন্নাথ দেখেন নাই বলিয়া মা কাপড়ের ভিতর ঠাকুরের ছবি লইয়া একদিন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইলেন।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া মা বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা কোরছি।" পুরী হইতে ফিরিয়া মা মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে তিন-চারি সপ্তাহ থাকিয়া আঁটপুর যান—সঙ্গে বাবুরাম, নরেন, মাষ্টার মহাশয়, সান্ন্যাল আরও সব ছিলেন। সেখানে ছয়-সাত দিন থাকিবার পর গরুর গাড়ীতে তারকেশ্বর হইয়া মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কামারপুকুর গেলেন। কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া দোলের পূর্ব্বে মা পুনরায় কলিকাতা আসেন এবং মাষ্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাড়ীতে মাসখানেক থাকেন। তারপর বলরাম বাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার দেহত্যাগ কাল পর্য্যন্ত তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। পরে বেলুড়ে শ্মশানের কাছে ঘুসুড়ীর বাড়ীতে

জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত (১৮৯০ খৃঃ) ছিলেন। সেখানে তাঁহার রক্ত-আমাশয় হওয়ায় বরাহনগরে সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। তারপর আষাঢ় মাসে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (১৮৯৩ খৃঃ) আসেন ও পরবর্ত্তী মাঘ-ফাল্গুনে কৈলোয়ার যাইয়া দুই মাস তথায় থাকেন। কৈলোয়ার হইতে তাঁহার মাতা ও ভাইদের সহিত মা পুনরায় কাশী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাড়ীতে প্রায় একমাস ছিলেন। তারপর দেশে যান। এবার দেশ হইতে ফিরিয়া বাগবাজার গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়ীতে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন—এই বাড়ীতে নাগ মহাশয় মাকে দর্শন করেন। পুনরায় দেশে যাইয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে মা ফিরিয়া আসিয়া গিরীশ বাবুর বাড়ীর সামনের বাড়ীতে থাকেন। এই বাড়ীতেই নিবেদিতা মায়ের সহিত প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তারপর গিরীশ বাবুর বাড়ীর নিকটে ১৬নং বোসপাড়া লেনে—যেখানে নিবেদিতা প্রথম স্কুল করিয়াছিলেন—সেই বাড়ীতে ছিলেন। ইহার পর

বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে (রামকৃষ্ণ লেনের সম্মুখে) আসিয়া তিনি থাকেন। সেখানে শরৎ মহারাজ ছিলেন। তারপর মা দেশে যান। পুনরায় গিরীশ বাবুর বাড়ীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মা তখন খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া 'উদ্বোধনের' নূতন বাড়ী হইলে তথায় আসিয়াছিলেন। তারপর কোঠার, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি 'উদ্বোধনে' ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কয়েকদিন পরে দেশে গিয়া রাধুর বিবাহ দেন। প্রায় এক বৎসর পর জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় (উদ্বোধনে) আসিয়াছিলেন। 'উদ্বোধন' হইতে কার্ত্তিক মাসে (১৯১২ খৃঃ) মা কাশী গেলেন এবং প্রায় তিন মাস কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাকে বাল্যকালে প্রায়ই রান্না করিতে হইত। তাঁহার মাতা বিশেষ কারণবশতঃ যখনই রান্না করিতে পারিতেন না, মা-ই তখন রান্না করিতেন। মা বলিতেন, "আমি রাঁধতুম, বাবা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন।" ইদানীং আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-সেবাতেই মায়ের কাল কাটিত।

শ্রীমতী—

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কি ভাবে জীবনযাপন করবো?"

মা বলিলেন, "যেমন করছো ঐ ভাবেই কাটিয়ে যাও। তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করবে; সদাসর্ব্বদা স্মরণ-মনন রাখবে।"

আমি—বড় বড় মহাপুরুষদেরই পতন হয় দেখে মনে বড় ভয় হয়, মা।

মা—ভোগের জিনিস সব নিয়ে থাকলে তার ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে। বাবা, কাঠেরও যদি মেয়েমানুষ হয়, তবে সেদিকে চাইবে না—সেদিক দিয়ে যাবে না।

আমি—মানুষ তো কিছুই করতে পারে না, তিনিই তো সব করাচ্ছেন।

মা—তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়? লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে আমি সব করছি—তাঁর উপর নির্ভর করে না। যে

তাঁর উপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

তারপর জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর বলতেন—'সাধু সাবধান!' সাধুর সর্ব্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্ব্বদা সাবধানে থাকবে। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্ব্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগলসের মত তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

"মন্দ কাজে মন সর্ব্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলস্যবশতঃ করলুম না; তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই। যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে

প্রার্থনা করতুম—'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' নবতে থাকবার সময় ঠাকুর এমন কি রামলালকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতেন, রামলাল তো ভাশুরপো হয়! এখন তো সকলের সঙ্গে কথা কই, সকলের সামনে বেরোই।

"তুমি কলকাতার ছেলে ইচ্ছা করলে বিয়ে করে সংসার করতে পারতে—সে সব যখন ত্যাগ করেছ, আবার সেদিকে লক্ষ্য করছো কেন? থুথু ফেলে আবার সেই থুথু-ঘাঁটা?"

* * *

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আসন-প্রণায়াম করা কি ভাল?"

মা—আসন-প্রণায়াম করলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।

আমি—সাধুর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভাল?

মা—মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?

আমি—মা, ধ্যান হয় না। কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে দিন।

মা—জাগবে বই কি। একটু ধ্যানজপ করলেই

জাগবে। আপনি কি আর জাগে? ধ্যানজপ কর। ধ্যান করতে করতে মন এমন স্থির হয়ে যাবে যে, ধ্যান আর ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। যেদিন ধ্যান না হবে, জোর করে ধ্যান করবার আবশ্যক নেই—সেদিন প্রণাম করেই উঠবে। যেদিন হবে আপনিই হবে।

৫ই আষাঢ়, (১৯-৬-১২)—উদ্বোধন

আমি—মা, মন স্থির হয় না কেন? যখন ভগবানের বিষয় চিন্তা করি, তখন মন নানা বিষয়ে যায়।

মা—বিষয় বলতে টাকাকড়ি, পুত্রপরিবার—এই সব বিষয়ে মন যাওয়া খারাপ। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে মন তো যাবেই। ধ্যান না হয় জপ করবে, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে। ধ্যান হল ভাল, না হয় জোর করে ধ্যান করবার দরকার নেই।

২৬শে অগ্রহায়ণ, (১৯১২)—কাশীধাম

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীতে মঠে থেকে সাধন-ভজন করা ভাল, না নির্জ্জনে সাধনভজন করা ভাল?"

মা বলিলেন, "নির্জ্জনে হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে

কিছুকাল সাধন-ভজন করে মন পাকলে তারপর মনকে যেখানেই রাখ, যে-লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপই থাকবে। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জ্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদিত হবে, জানবার ইচ্ছা হবে তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।”

আমি—আমার তো সাধন-ভজনের শক্তি নেই, আপনার পাদপদ্ম ধরে পড়ে আছি, যা হয় করুন।

মা হাতজোড় করিয়া ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “ঠাকুর তোমার সন্ন্যাস রক্ষা করুন। তিনি দেখছেন; তোমার ভয় কি? ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।”

১৭ই পৌষ—কাশীধাম

আমি—কিরূপ ভাবে কিরূপ স্থানে গিয়ে সাধন-ভজন করতে হবে?

মা—কাশী তোমাদের স্থান। সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে।

আমি—অনুরাগ না থাকলে শুধু নামজপ করলে কি হবে?

মা—জলেতে ইচ্ছা করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্ব্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।

আমি—জীবনের উদ্দেশ্য কি?

মা—ভগবানলাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মগ্ন হয়ে থাকা। তোমরা সন্ন্যাসী, তাঁর লোক। তোমাদের ইহকাল পরকাল তিনিই দেখছেন। তোমাদের ভাবনা কি? সর্ব্বদা কি ভগবানের চিন্তা করতে পারা যায়? কখনো বেড়াবে, কখনো তাঁর চিন্তা করবে।

১৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—কাশীধাম

মা—সাধুর রাগদ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর

দরকার। হৃদয়কে ঠাকুর বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো, তবে হবে ; তা না হলে খাজাঞ্চীকে ডাকতে হবে।'

২৩শে পৌষ, মঙ্গলবার, বেলা ৯॥টা—কাশীধাম

মা—ঠাকুর আমাকে বলতেন, 'একটু একটু বেড়াবে। না হলে শরীর খারাপ হবে।' আমি তখন নবতে থাকতুম। ভোর চারটায় গঙ্গাস্নান করে ঘরে ঢুকতুম। একদিন ঠাকুর আমায় বললেন, 'আজ একজন ভৈরবী আসবে, তার জন্যে একখানি কাপড় ছুপিয়ে রাখবে, তাকে দিতে হবে।' ঐদিন কালীঘরের ভোগ-রাগের পর ভৈরবী আসলে ঠাকুর তার সঙ্গে নানা কথা কইতে লাগলেন। ভৈরবীটির একটু মাথা গরম ছিল। সে আমায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করতো। কখনো কখনো আমায় বলতো, 'তুই আমার জন্যে পান্তা ভাত রাখবি। না রাখিস্ তো তোকে ত্রিশূলে করে মেরে রেখে যাব।' শুনে আমার ভয় হোত। ঠাকুর বলতেন, 'তোমার ভয় নেই, ও ঠিক ঠিক ভৈরবী, সেজন্য একটু মাথা গরম।' কখনো কখনো এত ভিক্ষা করে আনতো যে সাত-আট দিন চলতো। তাতে খাজাঞ্চী বলতেন, 'মা, তুমি কেন বাইরে ভিক্ষায় যাও, এখানেই

নিতে পার।' সে বলতো, 'তুই আমার কালনেমি মামা, তোর কথায় বিশ্বাস কি?'

"ঠাকুরের সাধন-অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিস দেখে তিনি জড়সড় হতেন এবং সে-সব প্রলোভনের জিনিস তিনি চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তার নিকটে এল। তিনি তাতে চিন্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হল? তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানস পুত্ররূপে ব্রজের রাখাল আসবে। যখন রাখাল এলো তখন তিনি বললেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। তোমার নামটি কি বল দেখি?'— 'রাখাল।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি।

"ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র, রাখাল, এ সবের জন্যে এত ভাবেন? সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না।' ঠাকুর বললেন, 'এই ছাখ, ঈশ্বরের ভাবে থাকি।' ইহা বলে তাঁর সমাধি হল। দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠলো। এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন। রামলাল তখন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল। নাম শুনাতে শুনাতে তবে তাঁর চৈতন্য হয়। সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বললেন, 'দেখ্লি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই

অবস্থা। তাই নরেন্দ্র এদের নিয়ে মনকে নীচে নামিয়ে রাখি।' রামলাল বললে, 'না, আপনি আপনার ভাবেই থাকুন'।"

আমি—একটু প্রণায়াম-অভ্যাস করছি। করবো কি?

মা—একটু একটু করতে পার, বেশী করে মাথা গরম করা ভাল নয়। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?

আমি—কুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হল না।

মা—জাগবে বই কি। তাঁর নাম করতে করতে সব হয়ে যাবে। মন স্থির না হলেও তো বসে বসে তাঁর লক্ষ লক্ষ নাম জপ করা যায়। কুণ্ডলিনী জাগবার পূর্ব্বে অনাহত ধ্বনি শোনা যায়। মা জগদম্বার কৃপা না হলে হয় না।

তারপর মা বলিলেন,—"শেষ রাত্রে মনে মনে ভাবছিলুম, বাবা বিশ্বনাথকে বুঝি আর দর্শন করতে পারব না। ছোট লিঙ্গমূর্ত্তি—আর যা সব জল-বিল্বপত্রে ডুবিয়ে রাখে, বাবাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি কি কালো কুচ্‌কুচে পাথরের শিবলিঙ্গ—বিশ্বনাথ! নটীর মা শিবের মাথায় হাত বুলুচ্ছে। আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলুম।"

আমি—মা, আমাদের আর পাথরের শিবলিঙ্গ ভাল লাগে না।

মা—সেকি বাবা! কত মহা মহা পাপী কাশীতে আসছে, আর বিশ্বনাথকে স্পর্শ করে উদ্ধার হচ্ছে! তিনি সকলের পাপ নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করছেন।

"শনি-রবিবারে যখন সব লোক এসে প্রণাম করে, তখন পা একেবারে জ্বলতে থাকে। পা ধুয়ে এসে তবে বসতে পারি।"

আমি—তিনি যদি সকলের বাপ-মা, তবে তিনি কেন পাপ করান?

মা—তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম্ম-অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক—কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

১লা জানুয়ারী, ১৯১৭

আমি বলিলাম, "মা, আমার ধ্যান যাতে ভাল হয় এবং তাঁতে মগ্ন হয়ে যেতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।" মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন আর বলিলেন, "সর্ব্বদা সদসদ্ বিচার করবে।"

আমি—মা, বসে বসে বিচার করতে পারি, কিন্তু

কার্য্যক্ষেত্রে বিচার আসে না ; তখন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শক্তি দিন যাতে সে সময় ঠিক থাকতে পারি।

মা—বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করবেন।

তারপর বলিলেন, "তোমার জ্ঞান চৈতন্য হোক।" জনৈক সন্ন্যাসী ভক্তকে মা বলিতেছেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ।"

২৭শে মে, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—মা, এতদিন গেল ! কি হল ?

মা—তিনি সংসারের সব ঝঞ্ঝাট হতে টেনে এনে তাঁর পাদপদ্মে রেখেছেন, এ কি কম ভাগ্য। যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বলতো, 'জপ-ধ্যান করি আর না করি, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট নেই।' দেখ না, আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নির্জ্জনে কোন বাগানে কিছুদিন সাধন করতে আমার ইচ্ছে হয়।"

মা—এই তো করবার সময়। এই বয়সেই করতে হয়। করবে বই কি ? কিন্তু খাওয়াদাওয়া-বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) কঠোর করে করে শেষে বড় কষ্ট পেয়ে শরীর গেল।

২৯শে মে, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি— —বাবু আর মঠে আসেন না। আপনার বাড়ীতেও আসেন না। তাঁর কেন এরূপ হল?

মা—হ্যাঁ, আমি যখন কলকাতায় ছিলুম তখনও আমার কাছে আসত না।

আমি—এত দিনের পুরনো ভক্ত, কেন এরূপ হল?

মা—সব কর্ম্মফল। অনেক জন্মের কর্ম্ম ছিল। শেষে আর থাকতে পারলে না। যে কটা ঢেউ আছে সব কেটে যাবে তো! এক জন্মে যে মুক্তি হবে!

আমি—তাঁর ইচ্ছায় যদি সব হচ্ছে তবে তিনি কাটিয়ে দেন না কেন?

মা—তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি সব কাটিয়ে দিতে পারেন। দেখ না, কর্ম্মের ফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। ঠাকুরের বড় ভাই (রামকুমার) বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নেন, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলি নি, তুইও তেমনি শেষ সময় কিছু খেতে পারবি নি।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি তো তোমার ভালর জন্যে করেছি, তুমি আমায় শাপ

দিলে।' তাতে তিনি কেঁদে বললেন, 'ভাই, কেন আমার মুখ হতে এমন কথা বের হল জানি নে।' দেখ, অসুখের সময় তাঁকেও কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়েছে। কোন জিনিস খেতে পারতেন না। এরও অনেক জন্মের সংস্কারের ফলে এরূপ হয়েছে। দেখ না, আ—র কি হল? কোথা হতে যে কি হয়, বুঝতে পারা মুশকিল।

৪ঠা জুন, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—মা, সংখ্যা রেখে জপ করবো কি?

মা—সংখ্যা রেখে জপ করলে সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকে। এমনি জপ করবে।

আমি—জপ করতে করতে মন কেন তাতে মগ্ন হয় না?

মা—করতে করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মত। বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনাবাসনা থাকলে মন স্থির হয় না। ঠিক ঠিক মন্ত্র-উচ্চারণ না হলে দেরী হয়। একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণী-নাথায়'। সে 'রুকু' 'রুকু'

জপ করতো। সেজন্যে তাকে কিছুদিন ঠেকতে হয়েছিল। পরে আবার তাঁর কৃপায় সে ঠিক মন্ত্র পায়।

১২ই জুন, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি— কিছুদিন হল আসন অভ্যাস করছি—শরীর ভাল থাকবার জন্যে। এই আসন অভ্যাস করলে হজম হয় ও ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে।

মা—শরীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে শরীর খারাপ হয়, এই বুঝে করবে।

আমি—মা, আমি পাঁচ-দশ মিনিট করি, ভাল হজম হবার জন্যে।

মা—তা করবে। কোন ব্যায়াম করে ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয় তাই বলছিলুম। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, চৈতন্য হোক।

শ্রী—